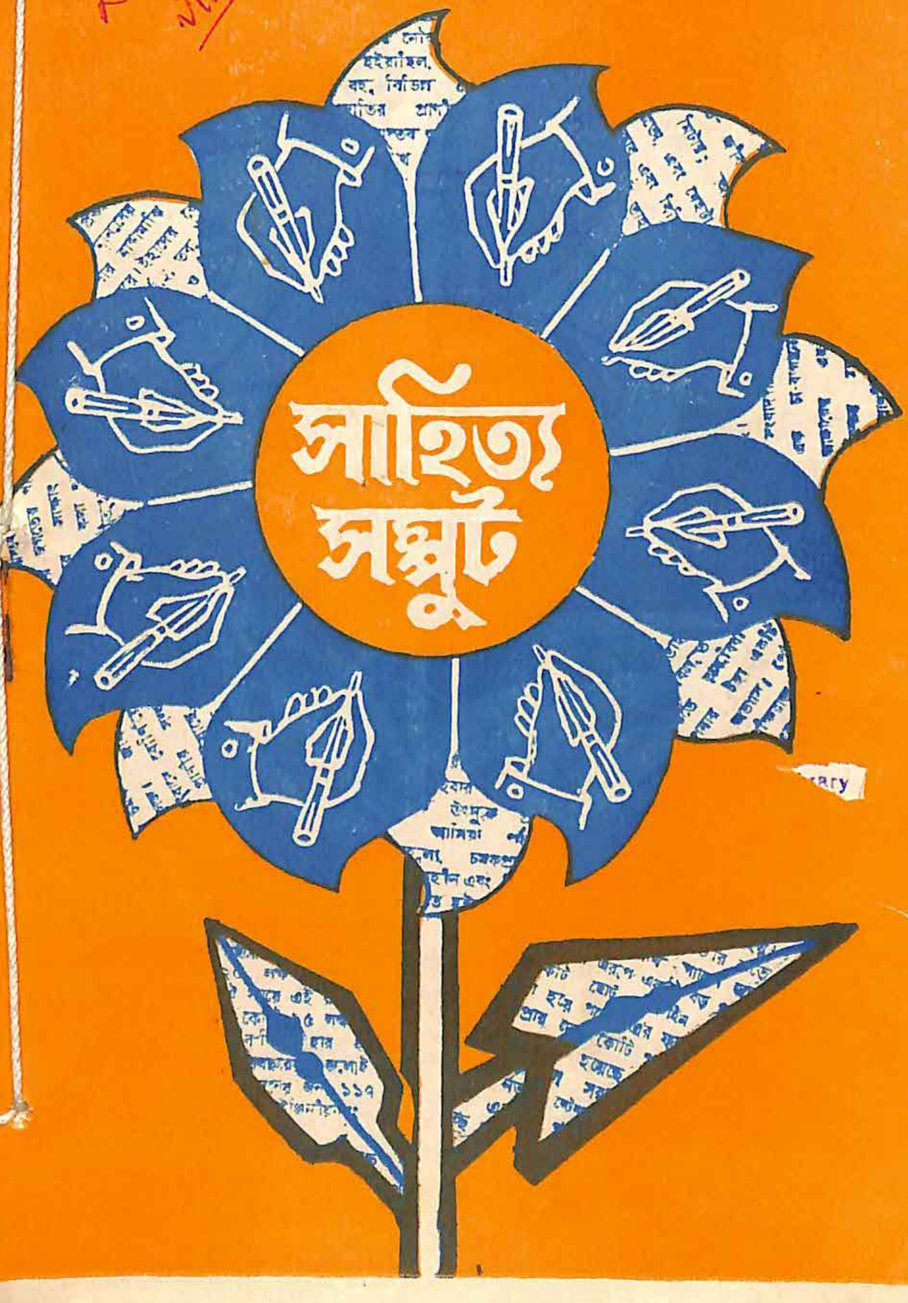
L 43 (ক)
সাহি

সাহিত্য সম্পুট





॥ পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক অনুমোদিত। পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তকরূপে লিখিত—Vide Notification No. TB/76/7/TB/89, dated 24/12/75 ॥

সাহিত্য সম্পুট

॥ প্রথম ভাগ ॥

॥ সপ্তম শ্রেণীর সর্বাধুনিক পাঠ্যসূচী অনুসরণে লিখিত ॥

শ্রীযুধিষ্ঠির রায়, এম. এ., বি. এড্.
প্রধান শিক্ষক, বহিড়া উচ্চবিদ্যালয়, হাওড়া
ও
এস. চট্টোপাধ্যায় এম. এ.

S.C.E.R.T., West Bengal
Library
Calcutta
25/3, B. C. Road

এস. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং
পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক
১০৩/বি, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯.

প্রকাশক :
এস, চট্টোপাধ্যায়
১০৩/বি, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

.C.E R.T. West Benga
Date 13-1-92
Acc. No....5048....

891.44
JUD

পঞ্চম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৮৩

মূল্য : চার টাকা চল্লিশ পয়সা মাত্র (টাকা ৪·৪০)

মুদ্রাকর :
অধীর ঘোষ
কালিকা জব্ প্রেস
১০৯/বি, কেশব সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

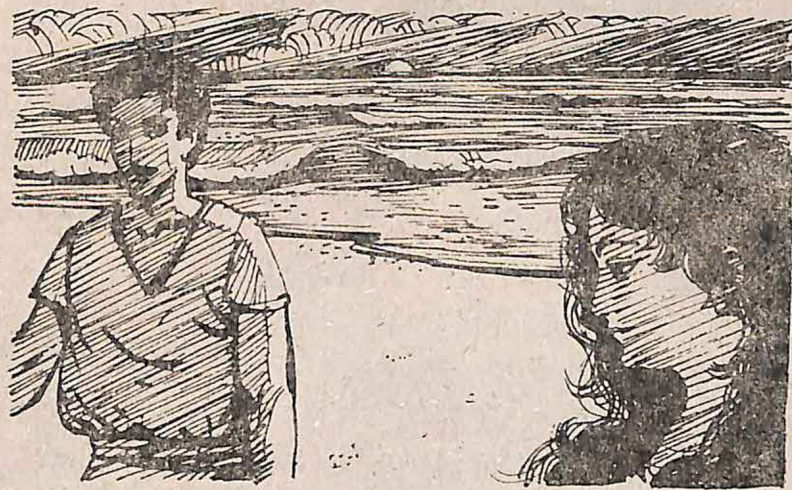
॥ সূচীপত্র ॥

॥ গদ্যাংশ ॥

॥ পদ্যাংশ ॥



গদ্যাংশ



সমুদ্রতটে

॥ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট ও বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (জন্ম—২৬ জুন, ১৮৩৮ ; মৃত্যু —৮ এপ্রিল, ১৮৯৪) রচিত 'কপালকুন্ডলা' একটি প্রসিদ্ধ উপন্যাস। উদ্ধৃত রচনাংশ ঐ উপন্যাস হইতে গৃহীত।

নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক যুবক গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমনকালে রসুলপুরের মোহানার নিকট সমুদ্রের তটদেশে সঙ্গিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া এক কাপালিকের দৃষ্টিগোচর হন। কাপালিক তাঁহাকে তাহার পর্ণ কুটিরে আশ্রয় দেয়। অতঃপর ঘটনাচক্রে সমুদ্রতটে কাপালিকের পালিতা কন্যা কপালকুন্ডলার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।]

প্রাতে উঠিয়া নবকুমার সহজেই বাটী গমনের উপায় করিতে ব্যস্ত হইলেন, বিশেষ কাপালিকের সান্নিধ্য কোনক্রমেই শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হইল না। কিন্তু আপাততঃ এ পথহীন বনমধ্য হইতে কি প্রকারে নিষ্ক্রান্ত হইবেন? কি প্রকারেই বা পথ চিনিয়া বাটী যাইবেন? কাপালিক অবশ্য পথ জানে; জিজ্ঞাসিলে কি বলিয়া দিবে না? বিশেষ, যতদূর দেখা গিয়াছে ততদূর কাপালিক তাঁহার প্রতি কোন শঙ্কাসূচক আচরণ করে নাই—কেনই বা তবে তিনি

ভীত হন ? এদিকে কাপালিক তাঁহাকে পুনঃ সাক্ষাৎ পর্যন্ত কুটীর ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছে, তাহার অবাধ্য হইলে বরং তাহার রোষোৎপত্তির সম্ভাবনা নবকুমার শ্রুত ছিলেন যে, কাপালিকেরা মন্ত্রবলে অসাধ্য সাধনে সক্ষম—এ কারণে তাহার অবাধ্য হওয়া অনুচিত। ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া নবকুমার আপাততঃ কুটীর মধ্যে অবস্থান করাই স্থির করিলেন।

কিন্তু বেলা অপরাহ্ন হইয়া আসিল, তথাপি কাপালিক প্রত্যাগমন করিল না। পূর্বদিনের উপবাস, অদ্য এ পর্যন্ত অনশন, ইহাতে ক্ষুধা প্রবল হইয়া উঠিল। কুটীর মধ্যে যে অল্পপরিমাণ ফলমূল ছিল, তাহা পূর্বরাত্রেই ভুক্ত হইয়াছিল—এক্ষণে কুটীর ত্যাগ করিয়া ফলমূলান্বেষণ না করিলে ক্ষুধায় প্রাণ যায়। অল্প বেলা থাকিতে ক্ষুধার পীড়নে নবকুমার ফলান্বেষণে বাহির হইলেন।

নবকুমার ফলান্বেষণে নিকটস্থ বালুকাস্তূপ সকলের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যে দুই একটা গাছ বালুকায় জন্মিয়া থাকে, তাহার ফলাস্বাদন করিয়া দেখিলেন যে, এক বৃক্ষের ফল বাদামের ন্যায় অতি সুস্বাদু, তদ্দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করিলেন।

কথিত বালুকাস্তূপশ্রেণী প্রস্থে অতি অল্প; অতএব নবকুমার অল্পকাল ভ্রমণ করিয়া তাহা পার হইলেন। তৎপরে বালুকা-বিহীন নিবিড় বনমধ্যে পড়িলেন। যাঁহারা ক্ষণকাল জন্য অপূর্ব-পরিচিত বনমধ্যে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে পথহীন বন-মধ্যে ক্ষণমধ্যেই পথভ্রান্তি জন্মে। নবকুমারের তাহাই ঘটিল। কিছু দূরে আসিয়া আশ্রম কোন্ পথে রাখিয়া আসিয়াছেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। গম্ভীর জলকল্লোল তাঁহার কর্ণপথে প্রবেশ করিল। তিনি বুঝিলেন যে, এ সাগরগর্জন। ক্ষণকাল পরে অকস্মাৎ বনমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন যে, সম্মুখেই সমুদ্র। অনন্ত-বিস্তার নীলাম্বুমণ্ডল সম্মুখে দেখিয়া উৎকটানন্দে হৃদয় পরিপ্লুত হইল। সিকতাময় তটে গিয়া উপবেশন করিলেন। ফেনিল, নীল, অনন্ত সমুদ্র। উভয়পার্শ্বে যতদূর চক্ষু যায়, ততদূর পর্যন্ত তরঙ্গ-ভঙ্গ-প্রক্ষিপ্ত

ফেনার রেখা ; স্তূপীকৃত বিমল-কুসুমদাম-গ্রথিত মালার ন্যায় সে ধবল ফেনরেখা হেমকান্ত সৈকতে ন্যস্ত হইয়াছে, কাননকুন্তলা ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ নীলজলমণ্ডল মধ্যে সহস্র স্থানে সফেন তরঙ্গ-ভঙ্গ হইতেছিল। যদি কখনও এমন প্রচণ্ড বায়ুবহন সম্ভব হয় যে, তাহার বেগে নক্ষত্রমালা সহস্রে সহস্রে স্থানচ্যুত হইয়া নীলাম্বরে আন্দোলিত হইতে থাকে, তবে সে সাগরতরঙ্গক্ষেপের স্বরূপ দৃষ্ট হইতে পারে। এ সময়ে অস্তগামী দিনমণির মৃদুল কিরণে নীল জলের একাংশ দ্রবীভূত সুবর্ণের ন্যায় জ্বলিতেছিল। অনতিদূরে কোন ইউরোপীয় বণিকজাতির সমুদ্রপোত শ্বেতপক্ষ বিস্তার করিয়া বৃহৎ পক্ষীর ন্যায় জলধিহৃদয়ে উড়িতেছিল।

কতক্ষণ যে নবকুমার তীরে বসিয়া অনন্যমনে জলধি-শোভা দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, তদ্বিষয়ে তৎকালে তিনি পরিমাণ-বোধ-রহিত। পরে একেবারে প্রদোষতিমির আসিয়া কাল জলের উপর বসিল। তখন নবকুমারের চেতনা হইল যে, আশ্রম সন্ধান করিয়া লইতে হইবে। দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন কেন, তাহা বলিতে পারি না—তখন তাঁহার মনে কোন্ ভূতপূর্ব সুখের উদয় হইতেছিল, তাহা কে বলিবে ? গাত্রোত্থান করিয়া সমুদ্রের দিকে পশ্চাৎ ফিরিলেন। ফিরিবা মাত্র দেখিলেন অপূর্ব মূর্তি ! সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব রমণী মূর্তি। কেশভার—অবেণীসংবদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্ফ-লম্বিত কেশভার ; তদগ্রে দেহরত্ন, যেন চিত্র-পটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না—তথাপি, মেঘবিচ্ছেদ-নিঃসৃত চন্দ্র-রশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাল লোচনে কটাক্ষ অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর অথচ জ্যোতির্ময় ; সে কটাক্ষ, এই সাগরহৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণলেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল। কেশরাশিতে স্কন্ধদেশ ও বাহুযুগল আচ্ছন্ন করিয়াছিল। স্কন্ধদেশ একেবারে অদৃশ্য ; বাহুযুগলের বিমলশ্রী কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল।

রমণীদেহ একেবারে নিরাভরণ। মূর্তিমধ্যে কি যে একটি মোহিনী শক্তি ছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। অর্ধচন্দ্রনিঃসৃত কৌমুদীবর্ণ; ঘনকৃষ্ণ চিকুরজাল; পরস্পরের সান্নিধ্যে কি বর্ণ, কি চিকুর, উভয়েরই যে শ্রী বিকসিত হইতেছিল, তাহা সেই গম্ভীরনাদী সাগরকূলে সন্ধ্যালোকে না দেখিলে, তাহার মোহিনী শক্তি অনুভূত হয় না।

নবকুমার অকস্মাৎ এইরূপ বনমধ্যে দৈবী মূর্তি দেখিয়া নিস্পন্দ-শরীর হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বাক্‌শক্তি রহিত হইল, স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। রমণীও স্পন্দহীন, অনিমেষলোচনে বিশাল চক্ষুর স্থিরদৃষ্টি নবকুমারের মুখে ন্যস্ত করিয়া রাখিলেন। উভয়মধ্যে প্রভেদ এই যে, নবকুমারের দৃষ্টি চমকিত লোকের দৃষ্টির ন্যায়। রমণীর দৃষ্টিতে সে লক্ষণ কিছুমাত্র নাই, কিন্তু তাহাতে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ হইতেছিল।

অনন্তর সমুদ্রের জনহীন তীরে, এইরূপে বহুক্ষণ দুই জনে চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে তরুণীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল। তিনি অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?"

প্রশ্নাবলী ?

॥ বিষয়গত প্রশ্ন ॥

১। প্রাতে উঠিয়া নবকুমারের মনে যে সব চিন্তা উঠিয়াছিল, তাহা বল।

২। বেলা অপরাহ্ণে নবকুমার ক্ষুধায় কাতর হইলেন কেন? তিনি কি করিলেন?

৩। নবকুমার কেন পথশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন? লেখকের বিবরণ অনুসরণে সমুদ্রতটের বর্ণনা দাও।

৪। সমুদ্রের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া নবকুমার কি মূর্তি দেখিলেন? ঐ মূর্তি দেখিয়া নবকুমারের কি অবস্থা হইল?

৫। নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার দৃষ্টির মধ্যে কি পার্থক্য ছিল?

৬। "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?"—কে কাহাকে কি প্রসঙ্গে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন?"

৭। প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা কর—

(ক) নবকুমার শ্রুত ছিলেন যে, কাপালিকেরা মন্ত্রবলে অসাধ্য-সাধনে সক্ষম—আপাততঃ কুটীর মধ্যে অবস্থান করাই স্থির করিলেন।

(খ) যদি কখনও এমন প্রচণ্ড বায়ু-বহন সম্ভব হয় যে, তাহার বেগে নক্ষত্রমালা সহস্রে সহস্রে স্থানচ্যুত হইয়া নীলাম্বরে আন্দোলিত হইতে থাকে, তবে সে সাগরতরঙ্গক্ষেপের স্বরূপ দৃষ্ট হইতে পারে।

(গ) উভয়মধ্যে প্রভেদ এই যে, নবকুমারের দৃষ্টি চমকিত লোকের দৃষ্টির ন্যায়। রমণীর দৃষ্টিতে সে লক্ষণ কিছুমাত্র নাই, কিন্তু তাহাতে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ হইতেছিল।

৮। নিম্নোক্ত শব্দগুলির অর্থ লেখ ঃ
কাপালিক, অপূর্বপরিচিত, জলকল্লোল, নীলাম্বুমণ্ডল, পরিপ্লুত, হেমকান্ত, মৃদুল, প্রদোষতিমির, গম্ভীরনাদী, আগুলফলম্বিত, কৌমুদীবর্ণ।

॥ ব্যাকরণগত প্রশ্ন ॥

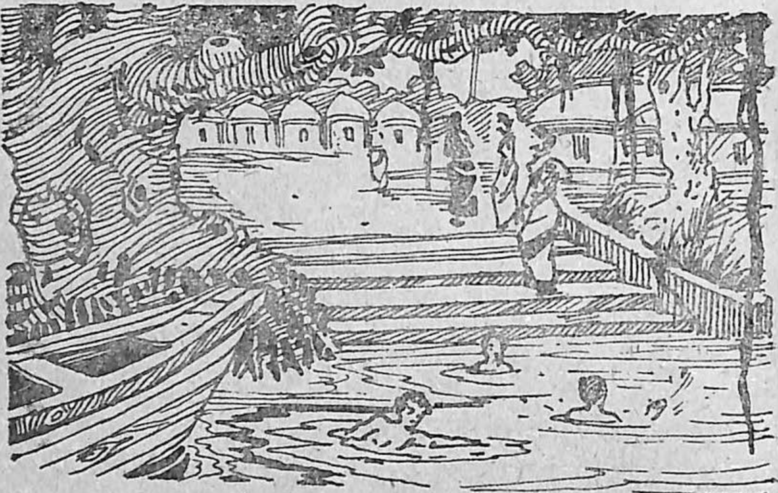
৯। পদ পরিবর্তন কর ঃ
নিষ্ক্রান্ত, ত্যাগ, শ্রুত, প্রবল, ফেনিল।

১০। সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ
নিরাভরণ, সন্ধ্যালোকে, গাত্রোত্থান, নীলাম্বর, ফলমূলান্বেষণ।

১১। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ ঃ
দীর্ঘনিশ্বাস, নক্ষত্রমালা, সাগরগর্জন, বালুকাবিহীন, স্থিরদৃষ্টি।

১২। স্থূল অক্ষরের শব্দগুলির পদ-পরিচয় দাও ঃ
নবকুমার **অকস্মাৎ** এইরূপ বনমধ্যে **দৈবী** মূর্তি দেখিয়া **নিস্পন্দশরীর** হইয়া দাঁড়াইলেন।

Description of a natural Scenery



গঙ্গার শোভা

॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥

[বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ (জন্ম—৭ মে, ১৮৬১, বাংলা ২৫ বৈশাখ, ১২৬৮ ; মৃত্যু—৭ আগষ্ট, ১৯৪১, বাংলা ২২ শে শ্রাবণ, ১৩৪৮) ছিলেন বিভিন্নমুখী প্রতিভার এক অত্যুজ্জ্বল আধার। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার (১৯১৩) বিশ্বকবিসভায় তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি। শুধু কবিতায় নয়, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, পত্রসাহিত্য, গান—সাহিত্যের যে কোন অঙ্গই তিনি স্পর্শ করিয়াছেন তাহাই তাঁহার অমৃতস্পর্শে সার্থক ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। শিক্ষাক্ষেত্রেও তাঁহার অসাধারণ চিন্তাভাবনার সাক্ষ্য স্বরূপ শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী আজও সগৌরবে বর্তমান।]

শান্তিপুরের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গাতীরের যেমন শোভা এমন আর কোথায় আছে ? গাছপালা, ছায়া, কুটীর—নয়নের আনন্দ অবিরল সারি সারি দুইধারে বরাবর চলিয়াছে—কোথাও বিরাম নাই। কোথাও বা তটভূমি সবুজ ঘাসে আচ্ছন্ন হইয়া গঙ্গার কোলে আসিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে, কোথাও বা একেবারে নদীর জল পর্যন্ত ঘন গাছপালা লতাজালে জড়িত হইয়া ঝুঁকিয়া আসিয়াছে—জলের উপর তাহাদের ছায়া অবিশ্রাম দুলিতেছে ; কতকগুলি সূর্য-কিরণ সেই ছায়ার মাঝে ঝিকমিক করিতেছে, আর বাকী কতকগুলি,

গাছপালার কম্পমান কচি মসৃণ সবুজ পাতায় চিক্‌চিক্‌ করিয়া উঠিতেছে। একটা নৌকা তাহার কাছাকাছি গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা রহিয়াছে এবং সেই ছায়ার নীচে অবিশ্রাম জলের কুলকুল শব্দে মৃদু দোল খাইয়া বড় আরামের ঘুম ঘুমাইতেছে। তাহার একপাশে বড় বড় গাছের ঘন ছায়ার মধ্য দিয়া ভাঙা ভাঙা বাঁকা একটা পদচিহ্নের পথ জল পর্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। সেই পথ দিয়া গ্রামের মেয়েরা কলসী কাঁখে করিয়া জল লইতে নামিতেছে। ছেলেরা কাদার উপর পড়িয়া, জল ছোঁড়াছুঁড়ি করিয়া সাঁতার কাটিয়া ভারি মাতামাতি করিতেছে।

প্রাচীন ভাঙা ঘাটগুলির কি শোভা! মানুষেরা যে এ ঘাট বাঁধিয়াছে তাহা একরকম ভুলিয়া যাইতে হয়; এও যেন গাছপালার মত গঙ্গাতীরের নিজস্ব। ইহার বড় বড় ফাটলের মধ্য দিয়া অশ্বত্থ গাছ উঠিয়াছে, ধাপগুলির ইঁটের ফাঁক দিয়া ঘাস গজাইতেছে—বহু বৎসরের বর্ষার জলধারায় গায়ের উপরে শেওলা পড়িয়াছে—এবং তাহার রঙ চারিদিকের শ্যামল গাছপালার রঙের সহিত কেমন সবুজে মিশিয়া গিয়াছে।

গ্রামের যে-সকল ছেলে-মেয়ে নাহিতে বা জল লইতে আসে, তাহাদের সকলেরই সঙ্গে ইহার যেন একটা কিছু সম্পর্ক পাতান আছে—কেহ ইহার নাতনী, কেহ ইহার মা-মাসী। তাহাদের দাদামহাশয় ও দিদিমারা যখন এতটুকু ছিল, তখন ইহারই ধাপে বসিয়া খেলা করিয়াছে, বর্ষার দিনে পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়াছে।

এক এক জায়গায় লোকালয়—সেখানে জেলেদের নৌকা সারি সারি বাঁধা রহিয়াছে। কতকগুলি জলে, কতকগুলি ডাঙায় তোলা। কতকগুলি তীরে উপুড় করিয়া মেরামত করা হইতেছে, তাহাদের পাঁজরা দেখা যাইতেছে।

কুঁড়ে ঘরগুলি কিছু ঘনঘন কাছাকাছি। কোন কোনটা বাঁকা-চোরা বেড়া দেওয়া—দুই চারিটি গরু চরিতেছে, গ্রামের দুই একটা

শীর্ণ কুকুর নিষ্কর্মার মত গঙ্গার ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, একটা উলঙ্গ ছেলে মুখের মধ্যে আঙ্গুল পুরিয়া বেগুনের ক্ষেতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া আমাদের জাহাজের দিকে চাহিয়া আছে। হাঁড়ি ভাসাইয়া লাঠি বাঁধা ছোট ছোট জাল লইয়া জেলের ছেলেরা ধারে ধারে চিংড়িমাছ ধরিয়া বেড়াইতেছে।

আবার আর একদিকে চড়ার উপরে বহুদূর ধরিয়া কাশবন; শরৎকালে যখন ফুল ফুটিয়া উঠে, তখন বায়ুর প্রত্যেক হিল্লোলে হাসির সমুদ্রে যেন তরঙ্গ উঠিতে থাকে।

যে কারণেই হউক, গঙ্গার ধারে ইটের পাঁজাগুলিও আমার দেখিতে ভাল লাগে; তাহাদের আশেপাশে গাছপালা থাকে না— চারিদিকে পোড়া জায়গা এব্ড়ো-খেব্ড়ো—ইতস্ততঃ কতকগুলি ইঁট খসিয়া পড়িয়াছে—অনেকগুলি ঝামা ছড়ানো—স্থানে স্থানে মাটি কাটা। অনুর্বরতা ও বন্ধুরতার মধ্যে পাঁজাগুলা কেমন হতভাগ্যের মত দাঁড়াইয়া থাকে।

গাছের শ্রেণীর মধ্য হইতে শিবের দ্বাদশ মন্দির দেখা যাইতেছে, সম্মুখে ঘাট। নহবৎখানায় নহবৎ বাজিতেছে। তাহার ঠিক পাশেই খেয়াঘাট—কাঁচা ঘাট, ধাপে ধাপে তালগাছের গুঁড়ি দিয়া বাঁধান। আরও দক্ষিণে কুমারদের বাড়ি, চাল হইতে কুমড়া ঝুলিতেছে।

একটি প্রৌঢ়া কুটীরের দেওয়ালে গোবর দিতেছে—প্রাঙ্গণ পরিষ্কার, তক্তক্ করিতেছে—কেবল এক প্রান্তে মাচার উপরে লাউগাছ লতাইয়া উঠিতেছে, আর একদিকে তুলসীতলা।

সূর্যাস্তের নিস্তরঙ্গ গঙ্গায় নৌকা ভাসাইয়া দিয়া গঙ্গার পশ্চিম পারের শোভা যে দেখে নাই, সে বাংলার সৌন্দর্য দেখে নাই বলিলেও হয়।

ক্রমে সন্ধ্যার আলো মিলাইয়া যায়, বনের মধ্যে এদিকে ওদিকে এক একটি করিয়া প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে। সহসা দক্ষিণের দিক হইতে একটা বাতাস উঠিতে থাকে—পাতা ঝর্ঝর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠে,

অন্ধকারে বেগবতী নদী বহিয়া যায়, কূলের উপরে অবিশ্রাম তরঙ্গ আঘাতে ছলছল করিয়া শব্দ হইতে থাকে—আর কিছু ভাল দেখা যায় না, শোনা যায় না। কেবল ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দ উঠে—আর জোনাকিগুলি অন্ধকারে জ্বলিতে-নিবিতে থাকে।

প্রশ্নাবলী ?

॥ **বিষয়গত প্রশ্ন** ॥

১। সংক্ষেপে গঙ্গাতীরের শোভা বর্ণনা কর।

২। গঙ্গার ভাঙা ঘাটগুলি সম্বন্ধে লেখক যাহা বলিয়াছেন, তাহা লিখ।

৩। গঙ্গার ধারে ইঁটের পাঁজাগুলি সম্বন্ধে লেখক যেসব মন্তব্য করিয়াছেন তাহার উল্লেখ কর।

৪। প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা কর ঃ

(ক) মানুষেরা যে এ ঘাট বাঁধিয়াছে তাহা একরকম ভুলিয়া যাইতে হয় ; এও যেন গাছপালার মত গঙ্গাতীরের নিজস্ব।

(খ) গ্রামের যে সকল ছেলে-মেয়ে নাহিতে বা জল লইতে আসে, তাহাদের সকলেরই সঙ্গে ইহার যেন একটা কিছু সম্পর্ক পাতান আছে—কেহ ইহার নাত্‌নী, কেহ ইহার মা-মাসী।

(গ) শরৎকালে যখন ফুল ফুটিয়া উঠে, তখন বায়ুর প্রত্যেক হিল্লোলে হাসির সমুদ্রে যেন তরঙ্গ উঠিতে থাকে।

(ঘ) সূর্যাস্তের নিস্তরঙ্গ গঙ্গায় নৌকা ভাসাইয়া দিয়া গঙ্গার পশ্চিম পারের শোভা যে দেখে নাই, সে বাংলার সৌন্দর্য দেখে নাই বলিলেও হয়।

৫। নিম্নোক্ত শব্দগুলির অর্থ লেখ ঃ

অবিরল, কম্পমান, উপুড়, হিল্লোল, পাঁজা, বন্ধুরতা, নহবৎখানা, নিস্তরঙ্গ।

॥ **ব্যাকরণগত প্রশ্ন** ॥

৬। পদ-পরিচয় দাও :

দক্ষিণ, জড়িত, মৃদু, ঘনচ্ছায়া, বাঁধা।

৭। পদ পরিবর্তন কর :

শোভা, আনন্দ, মসৃণ, শ্যামল, পরিষ্কার।

৮। নিম্নোক্ত শব্দগুলির সাহায্যে সার্থক বাক্য রচনা কর :

বিরাম, চিক্‌চিক্‌, পদচিহ্ন, উপুড়, খেয়াঘাট।

৯। সন্ধি-বিচ্ছেদ কর :

ঘনচ্ছায়া, লোকালয়, নিষ্কর্মা, ইতস্ততঃ, নিস্তরঙ্গ।

১০। ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম লেখ :

গঙ্গাতীর, সূর্যকিরণ, পদচিহ্ন, হতভাগ্য, তুলসীতলা।

১১। লিঙ্গ-পরিবর্তন কর :

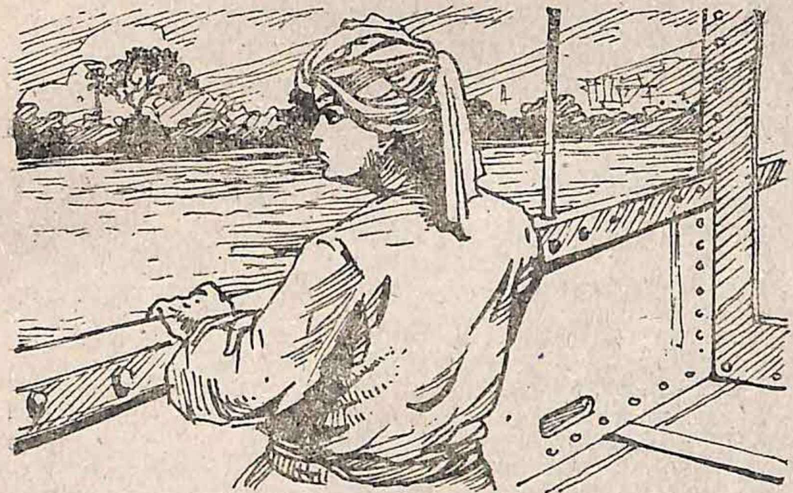
মেয়ে, দাদামহাশয়, কুকুর, প্রৌঢ়া, বেগবতী।

১২। মোটা অক্ষরের পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর :

(ক) শান্তিপুরের **দক্ষিণ** হইতে আরম্ভ করিয়া **গঙ্গাতীরের** যেমন **শোভা** এমন আর কোথায় আছে?

(খ) প্রাচীন ভাঙা **ঘাটগুলির** কি **শোভা**!

Description of the beauty of the Ganga.



সমুদ্র-যাত্রা

॥ স্বামী বিবেকানন্দ ॥

[পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য, ভারতপথিক, কর্মযোগী বৈদান্তিক সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের (জন্ম—১৮৬৩, মৃত্যু—১৯০২) সংসার আশ্রমে নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। পরিব্রাজকরূপে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো নগরীতে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে অসাধারণ পান্ডিত্য ও সুনিপুণ যুক্তিবিচারে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করিয়া স্বদেশ ও স্বধর্মের গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বর্তমান রচনাটি তাঁহার অন্যতম বিখ্যাত গ্রন্থ 'পরিব্রাজক' হইতে গৃহীত।]

আপনার লোকের একটি রূপ থাকে, তেমনটি আর কোথাও দেখা যায় না। নিজের খ্যাঁদা বোঁচা ভাইবোন ছেলেমেয়ের চেয়ে গন্ধর্ব-লোকে সুন্দর পাওয়া যাবে তা সত্য। কিন্তু গন্ধর্বলোক বেড়িয়েও যদি আপনার লোককে যথার্থ সুন্দর পাওয়া যায়, সে আহ্লাদ রাখবার কি আর জায়গা থাকে ? এই অনন্তশস্যশ্যামলা সহস্রস্রোত-স্বতীমাল্যধারিণী বাঙ্গলাদেশের একটি রূপ আছে। সে রূপ—কিছু আছে মলয়ালয়ে, আর কিছু কাশ্মীরে। জলের কি রূপ নাই ? জলে জলময়, মুষল ধারে বৃষ্টি, কচুর পাতার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে রাশি রাশি জল। নারিকেল খেজুরের মাথা একটু অবনত

হয়ে সে ধারাসম্পাত বইচে। চারিদিকে ভেকের ঘর্ঘর আওয়াজ,—এতে কি রূপ নাই? আর আমাদের গঙ্গার কিনার! বিদেশ থেকে না এলে, ডায়মণ্ডহারবারের মুখ দিয়ে গঙ্গায় প্রবেশ না করলে, সে রূপ বোঝা যায় না। সেই নীল নীল আকাশ, তার কোলে কাল মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ সোনালি কিনারাদার, তার নীচে ঝোপ ঝোপ তাল নারিকেল খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মত হেলচে। তার নীচে ফিকে, ঘন, ঈষৎ পীতাভ, একটু কাল মেশান, ইত্যাদি হরেক রকম সবুজের কাঁড়ি। কলা আম নীচু জাম কাঁটাল—পাতা আর পাতা—গাছ ডালপালা আর দেখা যাচ্ছে না। আশে পাশে ঝাড় ঝাড় বাঁশ হেলচে, দুলছে, আর সকলের নীচে —যার কাছে ইয়ারকান্দী ইরানি তুর্কিস্তানি গালচে কোথায় হার মেনে যায়—সেই ঘাস, যতদূর চাও সেই শ্যাম শ্যাম ঘাস, কে যেন ছেঁটে ছুঁটে ঠিক করে রেখেছে, জলের কিনারা পর্যন্ত সেই ঘাস; গঙ্গার মৃদু মন্দ হিল্লোল যে অবধি জমিকে ঢেকেছে, যে অবধি অল্প অল্প লীলাময় ধাক্কা দিচ্ছে, সে অবধি ঘাসে আঁটা। আবার তার নীচে আমাদের গঙ্গাজল। আবার গাঙের নীচে থেকে দেখ, ক্রমে উপরে যাও, উপর উপর মাথার উপর পর্যন্ত, একটি রেখার মধ্যে এত রঙের খেলা, একটি রঙে এত রকমারি, আর কোথাও দেখেছ? বলি, রঙের নেশা ধরেছে কখন কি—যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে? হুঁ, বলি—এই বেলা এ গঙ্গামার শোভা যা দেখবার দেখে নাও, আর বড় একটা কিছু থাকচে না। দৈত্য-দানবের হাতে পড়ে এ সব যাবে। ঐ ঘাসের জায়গায় উঠবে ইটের পাঁজা, আর নাববে ইটখোলার গর্তকুল। যেখানে গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলি ঘাসের সঙ্গে খেলা করচে, সেখানে দাঁড়াবেন পাট বোঝাই ফ্ল্যাট, আর সেই গাধাবোট। আর ঐ তাল তমাল আম নীচুর রঙ, ঐ নীল আকাশ, মেঘের বাহার, ওসব কি আর দেখতে পাবে? দেখবে—পাথুরে

কয়লার ধোঁয়া আর তার মাঝে মাঝে ভূতের মত অস্পষ্ট দাঁড়িয়ে আছেন কলের চিমনি !!!……

এইবার জাহাজ সমুদ্রে পড়ল! ঐ যে "দূরাদয়শ্চক্র…তমাল-তালীবনরাজি" ইত্যাদি—ওসব কিছু কাজের কথা নয়। মহা-কবিকে নমস্কার করি, কিন্তু তিনি বাপের জন্মে হিমালয় দেখেন নি, সমুদ্রও দেখেন নি, এই আমার ধারণা।

এইখানে ধলায় কালোয় মেশামেশি, প্রয়াগের কিছু ভাব যেন। সর্বত্র দুর্লভ হলেও "গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসংগমে।" তবে এ জায়গা, বলে—ঠিক গঙ্গার মুখ নয়। যা হোক আমি নমস্কার করি "সর্বাতোক্ষিশিরোমুখং" বলে।

কি সুন্দর! সামনে যতদূর দৃষ্টি যায়, ঘন নীলজল তরঙ্গায়িত, ফেনিল, বায়ুর সঙ্গে তালে তালে নাচছে। পেছনে আমাদের গঙ্গাজল, সেই বিভূতিভূষণা, সেই "গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতেঃ।" সে জল অপেক্ষাকৃত স্থির। সামনে মধ্যবর্তী রেখা। জাহাজ একবার সাদা জলের, একবার কাল জলের উপর উঠছে। ঐ সাদা জল শেষ হয়ে গেল। এবার খালি নীলাম্বু—সামনে পিছনে আশে পাশে খালি নীল নীল নীল জল, খালি তরঙ্গভঙ্গ। নীল-কেশ নীলকান্ত অঙ্গ-আভা, নীল পট্টবাস পরিধান। কোটি কোটি অসুর দেবভয়ে সমুদ্রের তলায় লুকিয়ে ছিল; আজ তাদের সুযোগ, আজ তাদের বরুণ সহায়, পবনদেব সাথী। মহাগর্জন, বিকট হুংকার, ফেনময় অট্টহাস, দৈত্যকুল আজ মহোদধির উপর রণতাণ্ডবে মত্ত হয়েছে। তার মাঝে আমাদের অর্ণবপোত, পোতমধ্যে যে জাতি সসাগরা ধরাপতি, সেই জাতির নরনারী—বিচিত্র বেশভূষা, স্নিগ্ধ চন্দ্রের ন্যায় বর্ণ, মূর্তিমান আত্মনির্ভর, আত্মপ্রত্যয়, কৃষ্ণবর্ণের নিকট দর্প ও দম্ভের ছবির ন্যায় প্রতীয়মান—সগর্বে পাদচারণ করছে। উপরে বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের জীমূতমন্দ্র, চারিদিকে শুভ্রশির তরঙ্গকুলের লম্ফঝম্প গুরুগর্জন, পোত-শ্রেষ্ঠের সমুদ্রবল উপেক্ষা-কারী মহাযন্ত্রের হুহুংকার—সে এক বিরাট সম্মিলন! তন্দ্রাচ্ছন্নের

ন্যায় বিস্ময়রসে আপ্লুত হয়ে তাই শুনছি। সহসা এ সমস্ত যেন ভেদ করে বহু স্ত্রী-পুরুষকণ্ঠের মিশ্রণোৎপন্ন গভীর নাদ ও তার সম্মিলিত "রুল ব্রিটানিয়া রুল দি ওয়েভস" সংগীতধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করল। চমকে চেয়ে দেখি—

জাহাজ বেজায় দুলচে, আর তু-ভায়া দুহাত দিয়ে মাথাটি ধরে অন্নপ্রাশনের অন্নের পুনরাবিষ্কারের চেষ্টায় আছেন।

সেকেণ্ড ক্লাসে দুটি বাঙ্গালীর ছেলে—পড়তে যাচ্ছে। তাদের অবস্থা ভায়ার চেয়েও খারাপ। একটি ত' এমনিই ভয় পেয়েছে যে, বোধ হয় তীরে নামতে পারলে একছুটে চোঁচা দেশের দিকে দৌড়ায়। যাত্রীদের মধ্যে তারা দুটি আর আমরা দুজন—ভারতবাসী, আধুনিক ভারতের প্রতিনিধি। যে দুদিন জাহাজ গঙ্গার মধ্যে ছিল, তু-ভায়া উদ্বোধন সম্পাদকের গুপ্ত উপদেশের ফলে "বর্তমান ভারত" প্রবন্ধ শীঘ্র শীঘ্র শেষ করবার জন্য দিক্ করে তুলতেন। আজ আমিও সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "ভায়া, বর্তমান ভারতের অবস্থা কিরূপ?" ভায়া একবার সেকেণ্ড ক্লাসের দিকে চেয়ে, একবার নিজের দিকে চেয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে জবাব দিলেন—"শোচনীয় - বড়ই—বেজায়—গুলিয়ে যাচ্চে।"

এতবড় গঙ্গা ছেড়ে, গঙ্গার মাহাত্ম্য হুগলি নামক ধারায় কেন বর্তমান, তার কারণ অনেকে বলেন যে ভাগীরথী-মুখই গঙ্গার প্রধান এবং আদি জলধারা। পরে গঙ্গা পদ্মা-মুখ করে বেরিয়ে গেছেন। ঐ প্রকার "টলিস্ নালা" নামক খালও আদি গঙ্গা হয়ে, গঙ্গার প্রাচীন স্রোত ছিল। কবিকঙ্কণ তাঁর বণিক নায়ককে ঐ পথেই সিংহল দ্বীপে নিয়ে গেছেন। পূর্বে ত্রিবেণী পর্যন্ত বড় বড় জাহাজ অনায়াসে প্রবেশ করত। সপ্তগ্রাম নামক প্রাচীন বন্দর এই ত্রিবেণী ঘাটের কিঞ্চিৎ পূর্বেই সরস্বতীর উপর ছিল। অতি প্রাচীনকাল হতেই এই সপ্তগ্রাম ছিল বঙ্গদেশের বহির্বাণিজ্যের প্রধান বন্দর। ক্রমে সরস্বতীর মুখ বন্ধ হতে লাগল। ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ঐ মুখ এত বুজে এসেচে যে, পর্তুগিজেরা আপনা-

-দের জাহাজ আনবার জন্যে কতকদূরে নীচে গিয়ে গঙ্গার উপর স্থান নিল। উহাই পরে বিখ্যাত হুগলি নগর। ১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হতেই স্বদেশী বিদেশী সওদাগরেরা গঙ্গায় চড়া পড়বার ভয়ে ব্যাকুল। কিন্তু হলে কি হবে; মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি আজও বড় একটা কিছু করে উঠতে পারে নি। মা গঙ্গা ক্রমশঃই বুজে আসচেন। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এক ফরাসী পাদরী লিখচেন, সূতির কাছে ভাগীরথীর মুখ সে সময়ে বুজে গিয়েছিল। অন্ধকূপের হলওয়েল, মুর্শিদাবাদ যাবার রাস্তায় শান্তিপুরে জল ছিল না বলে, ছোট নৌকা নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কাপ্তেন কোলব্রুক সাহেব লিখচেন যে গ্রীষ্মকালে ভাগীরথী আর জলঙ্গী নদীতে নৌকা চলে না। ১৮২২ থেকে ১৮৮৪ পর্যন্ত গরমিকালে ভাগীরথীতে নৌকার গমনাগমন বন্ধ ছিল।

প্রশ্নাবলী

॥ বিষয়গত প্রশ্ন ॥

১। লেখকের মন্তব্যসহ বাংলাদেশের নিজস্ব রূপের বর্ণনা দাও।

২। গঙ্গার শোভা সম্পর্কে লেখক কি বলিয়াছেন?

৩। "দৈত্য দানবের হাতে পড়ে এ সব যাবে।"—কি প্রসঙ্গে কি অর্থে লেখক এই মন্তব্য করিয়াছেন?

৪। লেখক সমুদ্রের কি বর্ণনা দিয়াছেন?

৫। "ভায়া, বর্তমান ভারতের অবস্থা কিরূপ?"—কি প্রসঙ্গে কাহাকে লেখক এই প্রশ্ন করিয়াছেন?

৬। প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা কর ঃ

(ক) আপনার লোকের একটি রূপ থাকে, তেমনটি আর কোথাও দেখা যায় না। (খ) কোটি কোটি অসুর দেবভয়ে সমুদ্রের তলায় লুকিয়ে ছিল;

আজ তাদের সুযোগ, আজ তাদের বরুণ সহায়, পবনদেব সাথী। মহা গর্জন, বিকট হুংকার, ফেনময় অট্টহাস, দৈত্যকুল আজ মহোদধির উপর রণতান্ডবে মত্ত হয়েছে।

৭। টীকা লেখ :

গন্ধর্বলোক, ইয়ারকান্দী, ইরানি, তুর্কিস্থানি, গালচে, গাধাবোট, উদ্বোধন।

৮। অর্থ লেখ :

অনন্তশস্যশ্যামলা, ধারাসম্পাত, ইটখোলা, নীলাম্বু, পট্টবাস, আপ্লুত, অন্নপ্রাশন, পাদরী।

॥ **ব্যাকরণগত প্রশ্ন** ॥

৯। নিম্নোক্ত শব্দগুলি লইয়া এক একটি সার্থক বাক্য রচনা কর :
খ্যাঁদা, ঘর্ঘর, হিল্লোল, গাধাবোট, তরঙ্গভঙ্গ।

১০। স্থূলাক্ষর পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর :

(ক) আপনার **লোকের** একটি রূপ থাকে।

(খ) সে রূপ—কিছু আছে মলয়ালয়ে, আর কিছু **কাশ্মীরে**।

(গ) সে অবধি **ঘাসে** আঁটা।

(ঘ) **ওসব** কি আর দেখতে পাবে ?

১১। ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম লেখ :

গন্ধর্বলোক, ধারাসম্পাত, অস্পষ্ট, দেবভয়, কৃষ্ণবর্ণ।

Description of a journey by sea and incidentally some glimpses of history.



চন্দ্রগুপ্ত

॥ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ॥

[কবি, সাঙ্গীতিক ও অগ্রগণ্য নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (জন্ম—১৯শে জুলাই, ১৮৬৩ ; মৃত্যু—১৭ই মে, ১৯১৩) একটি বিখ্যাত নাটক "চন্দ্রগুপ্ত"। মৌর্যবংশীয় মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের প্রসঙ্গ অবলম্বনে এই নাটকটি রচিত।]

[দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া। গ্রীকরাজ বীর সেকেন্দার ভারতেও হানা দিয়াছেন।

স্থান—সিন্ধু নদতট ; দূরে গ্রীক জাহাজ শ্রেণী। কাল—সন্ধ্যা।]

[নদতটে শিবির সম্মুখে সেকেন্দার ও সেলুকস্
অস্তগামী সূর্যের দিকে চাহিয়া ছিলেন।]

সেকেন্দার। সত্য সেলুকস! কি বিচিত্র এই দেশ! দিনে প্রচণ্ড সূর্য এর গাঢ় নীল আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায়, আর রাত্রিকালে শুভ্র চন্দ্রমা এসে তাকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়ে দেয়। তামসী রাত্রে অগণ্য উজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জে যখন এর আকাশ ঝলমল করে, আমি বিস্মিত আতঙ্কে চেয়ে থাকি। প্রাবৃটে ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি গুরু গম্ভীর গর্জনে প্রকাণ্ড দৈত্যসৈন্যের মত এর আকাশ ছেয়ে আসে ; আমি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখি। এর অভ্রভেদী ধবলতুষার-মৌলি নীল হিমাদ্রি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এর বিশাল নদ-নদী ফেনিল

উচ্ছ্বাসে উদ্দামবেগে ছুটেছে। এর মরুভূমি বিরাট স্বেচ্ছাচারের মত তপ্ত বালুরাশি নিয়ে খেলা করছে।

সেলুকস্। সত্য সম্রাট।

সেকেন্দার। কোথাও দেখি, তালীবন গর্বভরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে; কোথাও বিরাট বট স্নেহচ্ছায়ায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে; কোথাও মদমত্ত মাতঙ্গ জঙ্গম পর্বতসম মন্থর গমনে চলেছে; কোথাও মহাভুজঙ্গম অলস হিংসার মত বক্ররেখায় পড়ে আছে; কোথাও বা মহাশৃঙ্গ কুরঙ্গম মুগ্ধ বিস্ময়ের মত নির্জন বনমধ্যে শূন্য-প্রেক্ষণে চেয়ে আছে। আর সবার উপরে এক সৌম্য, গৌর, দীর্ঘকান্তি জাতি এই দেশ শাসন করছে। তাদের মুখে শিশুর সারল্য, দেহে বজ্রের শক্তি, চক্ষে সূর্যের দীপ্তি, বক্ষে বাত্যার সাহস। এ শৌর্য পরাজয় করে আনন্দ আছে। পুরুকে বন্দী করে আনি যখন—সে কি বললো জানো?

সেলুকস্। কি সম্রাট?

সেকেন্দার। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আমার কাছে কিরূপ আচরণ প্রত্যাশা কর?"—সে নির্ভীক নিষ্কম্প স্বরে উত্তর দিল, "রাজার প্রতি রাজার আচরণ।" চমকিত হলাম। ভাবলাম—এ একটা জাতি বটে। আমি তৎক্ষণাৎ তাকে তার রাজ্য প্রত্যর্পণ করলাম।

সেলুকস্। সম্রাট মহানুভব।

সেকেন্দার। মহানুভব! তারপরে তার সঙ্গে অন্যরূপ ব্যবহার সম্ভব? মহৎ কিছু দেখলেই একটা উল্লাস আসে। আর, আমি এখানে সাম্রাজ্য স্থাপন করতে আসি নাই। আমি এসেছি সৌখীন দিগ্বিজয়ে। জগতে একটা কীর্তি রেখে যেতে চাই।

সেলুকস্। তবে সে দিগ্বিজয় অসম্পূর্ণ রেখে যাচ্ছেন কেন সম্রাট?

সেকেন্দার। সে দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ করতে হলে নূতন গ্রীক সৈন্য চাই।—কি আশ্চর্য সেনাপতি! দূর মাসিডন থেকে কত রাজ্য, কত জনপদ তৃণসম পদতলে দলিত করে চলে এসেছি। ঝঞ্ঝার মত এসে

E.R.T., West Benga
13-1-92
No. 5048

মহাশত্রুসৈন্য ধূমরাশির মত উড়িয়ে দিয়েছি। অর্ধেক এসিয়া মাসিডনের বিজয় বাহিনীর বীরপদভরে কম্পিত হয়েছে। নিয়তির মত দুর্বার, হত্যার মত করাল, দুর্ভিক্ষের মত নিষ্ঠুর আমি অর্ধেক এসিয়ার বক্ষের উপর দিয়ে আমার রুধিরাক্ত বিজয়-শকট অবাধে চালিয়ে গিয়েছি। কিন্তু বাধা পেলাম প্রথম—সেই শতদ্রুতীরে।

[চন্দ্রগুপ্তকে ধরিয়া আন্টিগোনাসের প্রবেশ]

সেকেন্দার। কি সংবাদ আন্টিগোনাস? এ কে?

আন্টিগোনাস। গুপ্তচর।

সেলুকস্। সে কি!

সেকেন্দার। গুপ্তচর!

আন্টিগোনাস। আমি দেখলাম যে এক শিবিরের পাশে বসে নির্জনে শুষ্ক তালপত্রে কি লিখছিল। আমি দেখতে চাইলাম। পত্রখানি দেখাল। পড়তে পারলাম না—তাই সম্রাটের কাছে নিয়ে এসেছি।

সেকেন্দার। কি লিখছিলে যুবক? সত্য বল।

চন্দ্রগুপ্ত। সত্য বলব! রাজাধিরাজ! ভারতবাসী মিথ্যা কথা বলতে এখনও শিখে নাই।

[সেকেন্দার একবার সেলুকসের প্রতি চাহিলেন, পরে চন্দ্রগুপ্তকে কহিলেন]—"উত্তম। বল কি লিখছিলে।"

চন্দ্রগুপ্ত। আমি সম্রাটের বাহিনী চালনা, ব্যূহ-রচনা-প্রণালী, সামরিক নিয়ম, এইসব মাসাবধি কাল ধরে শিখছিলাম।

সেকেন্দার। কার কাছে?

চন্দ্রগুপ্ত। এই সেনাপতির কাছে।

সেকেন্দার। সত্য সেলুকস্?

সেলুকস্। সত্য।

সেকেন্দার। [চন্দ্রগুপ্তকে] তারপর?

S.C.E.R.T., West Bengal Library Calcutta 25/3, B. T. Road

চন্দ্রগুপ্ত। তারপর গ্রীক সৈন্য কাল এস্থান পরিত্যাগ করে যাবে শুনে, আমি যা শিখেছি তা এই পত্রে লিখে নিচ্ছিলাম।

সেকেন্দার। কি অভিপ্রায়ে ?

চন্দ্রগুপ্ত। সেকেন্দার সাহর সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য নহে।

সেকেন্দার। তবে ?

চন্দ্রগুপ্ত। তবে শুনুন সম্রাট। আমি মগধের রাজপুত্র চন্দ্রগুপ্ত। আমার পিতার নাম মহাপদ্ম। আমার বৈমাত্র ভাই নন্দ সিংহাসন অধিকার করে আমায় নির্বাসিত করেছে। আমি তারই প্রতিশোধ নিতে বেরিয়েছি।

সেকেন্দার। তারপর ?

চন্দ্রগুপ্ত। তারপর শুনলাম মাসিডন ভূপতির অদ্ভুত বিজয়বার্তা। অর্ধেক এসিয়া পদতলে দলিত করে, নদ-নদী-গিরি দুর্বার বিক্রমে অতিক্রম করে, শুনলাম তিনি ভারতবর্ষে এসে আর্যকুলরবি পুরুকে পরাজিত করেছেন। হে সম্রাট! আমার ইচ্ছা হল যে দেখে আসি—কি সে পরাক্রম, যার ভ্রুকুটি দেখে, সমস্ত এসিয়া তাঁর পদতলে লুটিয়ে পড়ে; কোথায় সে শক্তি লুকায়িত আছে, আর্যের মহাবীর্যও যার সংঘাতে বিচলিত হয়েছে। তাই এখানে এসে এই সেনাপতির কাছে শিক্ষা করছিলাম। আমার ইচ্ছা শুধু আমার হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করা। এই মাত্র।

প্রশ্নাবলী

॥ বিষয়গত প্রশ্ন ॥

১। "কি বিচিত্র এই দেশ!"—কে এই কথা বলিয়াছিলেন ? কাহাকে বলিয়াছিলেন ? কোন্ দেশের কথা বলা হইয়াছে ? দেশটিকে কেন "বিচিত্র" বলা হইয়াছে ?

২। পুরু কে ছিলেন? সেকেন্দার পরাজিত পুরুকে কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? পুরু উত্তরে কি বলিয়াছিলেন? সেকেন্দার তখন কি করিয়াছিলেন?

৩। দিগ্বিজয় অসম্পূর্ণ রাখিয়া সেকেন্দার ফিরিয়া যাইতেছিলেন কেন? তাঁহার দিগ্বিজয়ে তিনি প্রথম কোথায় ও কাহার নিকট বাধা পান?

৪। গ্রীক শিবিরের পাশে চন্দ্রগুপ্ত কি লিখিতেছিলেন? কেন লিখিতেছিলেন?

৫। প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা কর ঃ

(ক) আর সবার উপরে এক সৌম্য, গৌর, দীর্ঘকান্তি জাতি এই দেশ শাসন করছে। তাদের মুখে শিশুর সারল্য, দেহে বজ্রের শক্তি, চক্ষে সূর্যের দীপ্তি, বক্ষে বাত্যার সাহস।

(খ) মহৎ কিছু দেখলেই একটা উল্লাস আসে।

৬। নিম্নোক্ত শব্দগুলির অর্থ লেখ ঃ

অন্তর্যামী, প্রাবৃটে, ধবলতুষার-মৌলি, শূন্য-প্রেক্ষণে, আর্যকুলরবি, রুধিরাক্ত, জঙ্গমপর্বতসম।

॥ ব্যাকরণগত প্রশ্ন ॥

৭। পদ-পরিচয় দাও ঃ

অভ্রভেদী, বাত্যা, ভ্রূকুটি, বিচলিত, প্রতিশোধ।

৮। পদান্তর কর ঃ

উজ্জ্বল, আতঙ্ক, অলস, দীপ্ত, প্রত্যাশা, প্রত্যর্পণ, অধিকার, পরাক্রম।

৯। সার্থক বাক্য রচনা কর ঃ

হিমাদ্রি, কুরঙ্গম, বাত্যা, দুর্বার।

১০। সন্ধিবিচ্ছেদ কর ঃ

হিমাদ্রি, স্বেচ্ছাচার, প্রত্যাশা, প্রত্যর্পণ, দিগ্বিজয়, স্নেহচ্ছায়া, দুর্বার, উল্লাস।

১১। ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম লেখ ঃ

ধবলতুষার-মৌলি, বালুরাশি, রুধিরাক্ত, পদতল, গুরু-গম্ভীর।

Characteristics of India and ~~Stra~~ personality of Candragupta.



ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

॥ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ॥

(আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (জন্ম—১৮৬৪ : মৃত্যু—১৯১৯) বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয়ে প্রবন্ধকারদের পুরোধা। বর্তমান প্রবন্ধে তিনি তাঁহার অনুপম ভাষায় বিদ্যাসাগরের মহত্ত্বের কথা বলিয়াছেন। ইহা বক্তৃতাকারে প্রথম পঠিত হয়।)

আমাদের দেশে জীবনচরিত লেখা প্রচলিত নাই, এবং কোন ব্যক্তির জীবনচরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেও তাহার উপকরণ উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না। বিদ্যাসাগরের জীবন-চরিত রচনা করিয়া যাঁহারা জাতীয় সাহিত্যের এই কলঙ্ক অপনোদনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় এই অভাবের ও অসুবিধার বিশেষ ভুক্তভোগী। এরূপ স্থলে বিদ্যাসাগরের মত মহা-শয়গণের সম্পর্কে যিনি কখনও আসিবার সুবিধা পাইয়াছেন, যিনি কোন না কোন সূত্রে তাঁহার চরিত্রের কোন একটা দোষ দেখিতে পাইয়াছেন, তৎসমস্ত সাধারণের নিকট ব্যক্ত করা তাঁহাদের পক্ষে কর্তব্য। এই কর্তব্যের অনুরোধে আমার যাহা কিছু বলিবার আছে, ব্যক্তিগত হইলেও তাহা বলিতে সাহসী হইতেছি। বঙ্গদেশের মধ্যে ছোট বড় এমন ব্যক্তি অল্পই আছেন, যিনি কোন না কোন

প্রকারে বিদ্যাসাগরের নিকট ঋণগ্রস্ত নহেন। দূর মফঃস্বলের পল্লীগ্রামের মধ্যেও তাঁহার প্রভাব কতদূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহা চিন্তার অগোচর। মহতের আসনভূমি তীর্থস্বরূপ। বঙ্গদেশের পল্লীতে পল্লীতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা যে সময়ে বিদ্যাসাগরের কর্মবহুল জীবনের অন্যতম ব্যবসায় ছিল, সেই সময়ে আমার পিতামহের ক্ষুদ্র কুটির একদিন বিদ্যাসাগরের পাদস্পর্শে তীর্থস্থলে পরিণত হইয়াছিল। শৈশবকালে সেই গৌরবান্বিত দিবসের প্রসঙ্গক্রমে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে নানা কথা অন্তঃপুরবাসিনীগণের মুখেও শুনিতে পাইতাম। পাঠশালায় প্রবেশ লাভের পর বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, কথামালা, আখ্যানমঞ্জরী প্রভৃতি পুস্তক পরম্পরায় শুভ্র মলাটের উপর একই নাম অঙ্কিত দেখিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত পাঠশালা ও লেখাপড়া ও ছাপার বহি ও পণ্ডিত মহাশয়ের বেত্রদণ্ডের কিরূপ একটা অনির্বচনীয় সম্বন্ধ কল্পনায় স্থির করিয়া লইয়াছিলাম। বিদ্যাসাগরের আকৃতি ও পরিচ্ছদ ও কার্যাবলী সম্বন্ধে যে সকল গল্প শুনিতাম, তৎ-সমুদয় সেই কল্পনার সহিত বিজড়িত করিয়া অন্তঃকরণ একটা বিদ্যাসাগর মূর্তি গড়িয়া ফেলিয়াছিল। বটতলার পুস্তকের বোঝা মাথায় করিয়া চটিজুতাধারী রুক্ষবেশ পরুষমূর্তি এক ব্যক্তি আমাদের পল্লীগ্রামে মাঝে মাঝে দেখা দিত। শ্রোতৃগণ মার্জনা করিবেন, সেই লোকটাই যে নিশ্চিত বিদ্যাসাগর, এই ধারণা হইতে অব্যাহতি পাইতে আমাকে উত্তর কালে অনেক প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। আমার মনস্তত্ত্ববিৎ বন্ধুগণের উপর এই বিষম সমস্যার মীমাংসার ভার থাকিল।

১২৮৮ সালের ২১শে মাঘ তারিখে আমি কলিকাতা শহরে আসি; এবং ২৩শে তারিখে তীর্থযাত্রীর আগ্রহের সহিত পিতৃব্যদেবের সমভিব্যাহারে চিরকাঙ্ক্ষিত বিদ্যাসাগর-দর্শন-লালসা তৃপ্ত করিয়া জীবন ধন্য করি। শৈশবকালের কাল্পনিক বিদ্যাসাগরের সহিত প্রকৃত বিদ্যাসাগরের সাদৃশ্য দেখিয়াছিলাম কিনা, সে কথা

উত্থাপনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু সেই দিবস তাঁহার মুখ হইতে যে কয়েকটি বাক্য শুনিতে পাইয়াছিলাম, আজ পর্যন্ত তাহা আমার কর্ণবিবরে ধ্বনিত হইতেছে। আশা করি, সেই উদার প্রশস্ত স্নেহপূর্ণ হৃদয় হইতে নিঃসৃত হইয়া সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর বঙ্গের যে সকল পুত্রকন্যার শ্রবণপথে প্রবেশলাভ করিয়া হৃদয়ের ভিত্তিমূলে আঘাত দিয়াছে, তাঁহারা চিরদিন সেই কণ্ঠস্বরের স্মৃতি কর্তৃক প্রেরিত হইয়া সংসারের কর্মক্ষেত্রে বিচরণ করিবেন। সেই প্রাচ্য মনুষ্যত্বের আদর্শ তাঁহাদের জীবনকে যুগপৎ প্রণোদিত ও সংযমিত রাখিবে। আমাদের এই দুর্দিনেও যদি মনুষ্যত্বের সেই আদর্শের আবির্ভাব সম্ভবপর হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের প্রাচীনা পূজনীয়া জননীর দেহে নবজীবন সঞ্চারের আশা কি কখনই ফলিবে না! কিন্তু ভবিষ্যতের ঘনান্ধকার ভিন্ন করিয়া দীপবর্তিকা আনয়ন করিবে কে? কে বলিবে, আমাদের পরিণতি কোথায়? মহাপুরুষের আবির্ভাব ভারতভূমিতে নূতন ঘটনা নহে। আশা যে, মহাপুরুষের আবির্ভাবই ভারতের উদ্ধার সাধনে সমর্থ হইবে। কিন্তু ভবিষ্যতের সেই মহাপুরুষ কোথায়? দগ্ধাস্থিপঞ্জরময় ভারতের এই মহাশ্মশানে এই মৃতজাতির শবদেহে নূতন জীবন সঞ্চার করিবে কে?

প্রশ্নাবলী?

॥ বিষয়গত প্রশ্ন ॥

১। আমাদের দেশে জীবনচরিত লেখা সহজ নয় কেন?
২। বিদ্যাসাগর রচিত কয়েকটি পুস্তকের নাম লিখ।
৩। বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব সম্বন্ধে লেখক যাহা বলিয়াছেন, সংক্ষেপে নিজের ভাষায় তাহা লিখ।

৪। প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা কর ঃ

(ক) মহতের আসনভূমি তীর্থস্বরূপ।

(খ) বটতলার পুস্তকের বোঝা মাথায় করিয়া চটিজুতাধারী রুক্ষবেশ পরুষমূর্তি এক ব্যক্তি আমাদের পল্লীগ্রামে মাঝে মাঝে দেখা দিত; সেই লোকটাই যে নিশ্চিত বিদ্যাসাগর, এই ধারণা হইতে অব্যাহতি পাইতে আমাকে উত্তর কালে অনেক প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল।

(গ) দগ্ধাস্থিপঞ্জরময় ভারতের এই মহাশ্মশানে এই মৃত জাতির শবদেহে নূতন জীবন সঞ্চার করিবে কে?

৫। নিম্নোক্ত শব্দগুলির অর্থ লিখ ঃ

কলঙ্ক, অপনোদন, অগোচর, চটিজুতাধারী, সমভিব্যাহারে, প্রাচ্য, দীপবর্তিকা, দগ্ধাস্থিপঞ্জরময়।

॥ ব্যাকরণগত প্রশ্ন ॥

৬। পদপরিচয় দাও ঃ

মনস্তত্ত্ব, তীর্থস্থল, শ্রোতৃগণ, ধন্য, ঘনান্ধকার।

৭। পদান্তর কর ঃ

প্রবৃত্ত, পরিচিত, সম্ভবপর, আবির্ভাব, স্নেহপূর্ণ।

৮। স্থূলাক্ষর পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ

(ক) বঙ্গদেশের মধ্যে ছোট বড় এমন **ব্যক্তি** অল্পই আছেন, যিনি কোন না কোন **প্রকারে** বিদ্যাসাগরের নিকট ঋণগ্রস্ত নহেন।

(খ) বটতলার পুস্তকের **বোঝা** মাথায় করিয়া চটিজুতাধারী রুক্ষবেশ পুরুষমূর্তি এক ব্যক্তি আমাদের পল্লীগ্রামে মাঝে মাঝে দেখা দিত।

(গ) **মহাপুরুষের** আবির্ভাব **ভারতভূমিতে** নূতন ঘটনা নহে।

৯। সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ

চিরাকাঙ্ক্ষিত, আবির্ভাব।

১০। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লিখ ঃ

ঋণগ্রস্ত, বিদ্যাসাগর, বর্ণপরিচয়, পরুষমূর্তি, স্নেহপূর্ণ, পুত্রকন্যা, মহাপুরুষ।

Some salient features of the Character of Vidyasagar.



শ্রীকান্তের নিশীথ অভিযান

॥ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥

[রবীন্দ্রযুগীয় বাংলা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়, মানবদরদী ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (জন্ম—১৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৬ ; মৃত্যু - ১৬ জানুয়ারি, ১৯৩৮) আত্মজীবনীমূলক বিখ্যাত উপন্যাস "শ্রীকান্ত"। উদ্ধৃত রচনাটি তাঁহার এই উপন্যাসের প্রথম খণ্ড হইতে গৃহীত।]

[শ্রীকান্ত ও তাহার বন্ধু ইন্দ্রনাথ, লুকাইয়া মাছ ধরিতে গিয়াছে—সেই কাহিনীই এখানে বর্ণিত।]

সে মুখে একবার বলিল, "ভয় নাই।" কিন্তু গলাটা তাহার যেন কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু সে থামিল না। প্রাণপণে লগি ঠেলিয়া ক্রমাগত ভিতরে লুকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সমস্ত চড়াটা জলে জলময়। তাহারই উপর ৮।১০ হাত দীর্ঘ ভুট্টা এবং জনারের গাছ। ভিতরে এই দুটি চোর। কোথাও জল একবুক, কোথাও জল এককোমর, কোথাও হাঁটুর অধিক নয়। উপরে নিবিড় অন্ধকার, সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে বামে দুর্ভেদ্য জঙ্গল। পাঁকে লগি পুঁতিয়া যাইতে লাগিল, নৌকা আর এক হাতও অগ্রসর হয় না। পিছন হইতে জেলেদের অস্পষ্ট কথাবার্তা কানে আসিতে লাগিল। কিছু একটা সন্দেহ করিয়াই যে তাহারা

আসিয়াছে এবং তখনও খুঁজিয়া ফিরিতেছে, তাহাতে লেশমাত্র সংশয় নাই।

সহসা নৌকাটি একটু কাত হইয়াই সোজা হইল। চাহিয়া দেখি, আমি একাকী বসিয়া আছি, দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। সভয়ে ডাকিলাম, "ইন্দ্র!" হাত পাঁচ ছয় দূরে বনের মধ্য হইতে সাড়া আসিল, "আমি নীচে।"

"নীচে কেন?"

"ডিঙি টেনে বার করতে হবে। আমার কোমরে দড়ি বাঁধা আছে।"

"টেনে কোথায় বার করবে?"

"ও গঙ্গায়। খানিকটা যেতে পারলেই বড় গাঙে পড়ব।"

শুনিয়া চুপ করিয়া গেলাম। ক্রমশ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অকস্মাৎ কিছু দূরে বনের মধ্যে ক্যানেস্ত্রা পিটানো ও চেরা-বাঁশের কটাকট শব্দে চমকাইয়া উঠিলাম। সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ও কি ভাই?" সে উত্তর দিল, "চাষীরা মাচার উপর বসে বুনো শূয়ার তাড়াচ্ছে।"

"বুনো শূয়ার! কোথায় সে?" ইন্দ্র নৌকা টানিতে টানিতে তাচ্ছিল্য ভরে কহিল, "আমি কি দেখতে পাচ্ছি, যে বলব। আছেই কোথাও এইখানে।" জবাব শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। ভাবিলাম, কার মুখ দেখিয়া আজ প্রভাত হইয়াছিল। তথাপি আমি ত নৌকায় বসিয়া, কিন্তু, ঐ লোকটি একবুক কাদা ও জলের মধ্যে এই বনের ভিতরে! এক পা নড়িবার চড়িবার উপায় পর্যন্ত তাহার নাই। মিনিট পনর এইভাবে কাটিল। আর একটি জিনিস লক্ষ্য করিতেছিলাম। প্রায়ই দেখিতেছি, কাছাকাছি এক একটা জনার বা ভুট্টা গাছের ডগা ভয়ানক আন্দোলিত হইয়া ছপাৎ করিয়া শব্দ হইতেছে। একটা প্রায় আমার হাতের কাছেই হইল। সশঙ্কিত হইয়া সেদিকে ইন্দ্রর মনোযোগ আকৃষ্ট করিলাম। ধাড়ী শূয়ার না হইলেও বাচ্চা টাচ্চা নয় ত?

ইন্দ্র অত্যন্ত সহজভাবে কহিল, "ও কিছু না—সাপ জড়িয়ে আছে, তাড়া খেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।"

কিছু না—সাপ! শিহরিয়া নৌকার মাঝখানে জড়সড় হইয়া বসিলাম। অস্ফুটে কহিলাম, "কি সাপ, ভাই?"

ইন্দ্র কহিল, "সব রকম আছে। ঢোড়া, বোড়া, গোখরো, করেত—জলে ভেসে এসে গাছে জড়িয়ে আছে—কোথাও ডাঙা নেই, দেখছিস নে?"

সে ত দেখিতেছি। কিন্তু ভয়ে যে পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত আমার কাঁটা দিয়া রহিল। সে লোকটি কিন্তু ভ্রূক্ষেপ মাত্র করিল না, নিজের কাজ করিতে করিতে বলিতে লাগিল—"কিন্তু কামড়ায় না। ওরা নিজেরাই ভয়ে মরচে—দুটো তিনটে ত আমার পা ঘেঁষে পালাল। এক একটা মস্ত বড়—সেগুলো বোড়া ঢোড়া হবে বোধ হয়। আর কামড়ালেই বা কি করব! মরতে একদিন ত হবেই ভাই!" এমনি আরও কত কি সে মৃদু স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিতে বলিতে চলিল, আমার কানে কতক পৌঁছিল, কতক পৌঁছিল না। আমি নির্বাক নিস্পন্দ কাঠের মত আড়ষ্ট হইয়া একস্থানে একভাবে রহিলাম, নিশ্বাস ফেলিতেও যেন ভয় করিতে লাগিল—ছপাৎ করিয়া একটা যদি নৌকার উপরেই পড়ে।

কিন্তু সে যাই হোক, ওই লোকটি কি। মানুষ? দেবতা? পিশাচ? কে ও? কার সঙ্গে এই বনের মধ্যে ঘুরিতেছি?

প্রশ্নাবলী ?

॥ **বিষয়গত প্রশ্ন** ॥

১। "ভিতরে এই দুইটি চোর"—কাহাদের কথা বলা হইয়াছে? কেন বলা হইয়াছে?

২। জেলেরা কি সন্দেহ করিয়াছিল ?

৩। চাষীরা ক্যানেস্ত্রা পিটাইতেছিল কেন ? কোথায় বসিয়া তাহারা ইহা করিতেছিল ?

৪। ছপাৎ করিয়া জলে কি পড়িতেছিল ? কেন পড়িতেছিল ?

৫। ইন্দ্রনাথ কি কি সাপের নাম করিয়াছিল ? তাহারা গাছে উঠিয়া জড়াইয়া ছিল কেন ?

৬। "এমনি আরও কত কি সে মৃদু স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিতে বলিতে চলিল"—কে বলিতেছিল ? কি বলিতেছিল ? কেন বলিতেছিল ?

৭। "ওই লোকটি কি! মানুষ ?"—কে কাহার সম্বন্ধে এই প্রশ্ন করিতেছে ?

৮। প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা কর ঃ

(ক) জবাব শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। ভাবিলাম, কার মুখ দেখিয়া আজ প্রভাত হইয়াছিল।

(খ) সে যাই হোক, ওই লোকটি কি ! মানুষ ? দেবতা ? পিশাচ ? কে ও ?

৯। নিম্নোক্ত শব্দগুলির অর্থ লিখ ঃ

লগি, চড়া, দুর্ভেদ্য, লেশমাত্র, ধাড়ী, অস্ফুট, নিস্পন্দ, পিশাচ।

॥ ব্যাকরণগত প্রশ্ন ॥

১০। পদান্তর কর ঃ

ভয়, জলময়, দীর্ঘ, নিবিড়, স্তব্ধ।

১১। নিম্নোক্ত শব্দগুলির সাহায্যে সার্থক বাক্য রচনা কর ঃ—

প্রাণপণে, লেশমাত্র, সভয়ে, ভ্রূক্ষেপ, পিশাচ।

১২। মোটা অক্ষরের ক্রিয়াগুলির কাল নির্ণয় কর ঃ

(ক) সে মুখে **বলিল**, "ভয় নাই।"

(খ) কিছু একটা সন্দেহ করিয়া তাহারা **আসিয়াছে** এবং তখনও খুঁজিয়া **ফিরিতেছে**।

(গ) চাহিয়া **দেখি** আমি একাকী বসিয়া আছি।

(ঘ) সভয়ে **ডাকিলাম**, "ইন্দ্র!"

(ঙ) "টেনে কোথায় বার **করবে** ?"

(চ) **ভাবিলাম**, কার মুখ দেখিয়া আজ প্রভাত **হইয়াছিল**।

Story of a night adventure of a courageous boy.



বিচিত্র মানুষ

॥ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

[রচনাটিতে স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর (জন্ম—২৩শে জুলাই, ১৮৯৮ ; মৃত্যু—১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১) তাঁহার এক শৈশব স্মৃতির কথা বলিয়াছেন। বীরভূমের মানুষ তারাশঙ্কর শরৎচন্দ্রের পরে বাংলা সাহিত্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক ছিলেন। বীরভূম-বাঁকুড়া অঞ্চলের প্রকৃতির রুক্ষ ভীষণ রূপ ও দরিদ্র, নিপীড়িত সাধারণ মানুষের আলেখ্য চিত্রণে তাঁহার উপন্যাসগুলি বর্ণোজ্জ্বল।]

সকাল থেকে বাউল বৈষ্ণব আসতেন ভিক্ষা করতে। খঞ্জনি একতারা বাজিয়ে গান গাইতেন। পদাবলীর গায়কও দু-চারজন ছিলেন। শাক্ত সন্ন্যাসীও আসতেন। প্রচণ্ড জোরে হাঁক মারতেন —চে-ৎ চণ্ডী! কালী কপালী নরমুণ্ডমালী, বন্ধন কাট্ মা, বন্ধন কাট্! মুসলমান ফকির আসতেন, বয়েৎ আওড়াতেন, তাঁদের কারও কারও হাতে চামড়ার আবরণীর উপর শিক্রে পাখি (বাজ পাখিরই একটি ছোট জাত) থাকত, কেউ কেউ গান গাইতেন—দেশী, হাড়ের তৈরী সারেঙ্গী জাতের যন্ত্র বাজিয়ে। প্রায় সব গানই ছিল গোপাল-হারা মা যশোদার বেদনার গান।

কেউ কেউ পীরমঙ্গল গাইতেন। অঞ্চলে যত পীর আছেন,

হিন্দুর জাগ্রত দেবতা আছেন, সবাই ছিলেন পীর, সকলের মহিমাই কীর্তন করতেন তাঁরা। সে কি হিন্দুর দোরে, কি মুসলমানের দোরে, তাঁরা ঐ গানই গেয়ে যেতেন—সকলেই ভক্তি-পুলকিত চিত্তে শুনত।

পীর বড় ধনী রে ভাই—ঠাকুর বড় ধনী—।
পীর গাজী—মুস্কিল আসান কর, পীর গাজী—।
তোমার গোপাল দুগ্ধ খাবেন জন্ম যাবে সুখে—।
দুঃখ তোমার দূরে যাবে—অন্ন দিয়ো মুখে।

মস্ত বড় গান। আজও মনে পড়ে আমার।

আর মধ্যে মধ্যে আসত 'গরুমারা'। অর্থাৎ গোবধ করে প্রায়শ্চিত্তকারী ভিক্ষুক। আমার মনের মধ্যে আজও ছাপ কেটে রয়েছে প্রথম 'গরুমারা'র ছবি। গরমের সময় স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে আমাদের ভাঁড়ার ঘরের দাওয়ার উপর তেঁতুল থেকে বীচি ছাড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। মা পিসীমা ঝি রাঁধুনী, এদের সঙ্গে আমিও বসে গেছি। আমার সঙ্গে আছে আমার শৈশব-সঙ্গিনী চারু, ডাক নাম নেতা; সকলেই এক একটা পাথর দিয়ে ছেঁচে তেঁতুল বীচি বের করছি। হঠাৎ সদর দোরে ডাক উঠল, হাম্-বা, অ্যা-ম-ব্যা—অ্যাম-ব্যা! সমস্ত শরীর যেন কেমন করে উঠল। দরজায় উঁকি মেরে দেখলাম, ধূলিধূসর কৌপিন পরনে একটি জোয়ান মানুষ হাতে একগাছা দড়ি নিয়ে এমনি চীৎকার করছে, অ্যা-ম-ব্যা। অকস্মাৎ মানুষের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেলে যে উদ্বেগ তার বুকখানাকে তোলপাড় করে তোলে—সেই অসহনীয় উদ্বেগ আমার শিশুচিত্তকে অধীর অস্থির করে তুলেছিল। আমি সমস্ত দিন কেঁদেছিলাম। মায়ের কাছে শুনেছিলাম, এইভাবে বারো বৎসর তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

সপ্তাহে দু-তিন দিন আসত পটুয়ারা। দ্বিজপদ পটুয়াকে আজও মনে আছে। সুন্দর চেহারা ছিল তার। তেমনি সে গান গাইত। লম্বা পট খুলে কৃষ্ণলীলা-রামলীলা-গৌরাঙ্গলীলার পর

পর সাজানো ছবি দেখিয়ে যেত, আর গান গেয়ে যেত—'আহা কি মধুর লীলা রে।'

বেদিয়ারা আসত। দেশী বেদিয়া, সাপুড়ে। এরা সাধারণত আসত বর্ষার সময়, মাঠে আল-কেউটে ধরত—গ্রামে সাপ দেখিয়ে গান গেয়ে ভিক্ষা করত, বাঁদর নাচাত, আর চলত। ওরা যেত মেদিনীপুর পর্যন্ত। তাদের মুখেই শুনেছিলাম, মেদিনীপুর অঞ্চলে কবিরাজ ছিলেন অনেক, তাঁরা কালো কেউটের বিষ কিনতেন এবং তা দিয়ে ওষুধ তৈরী করতেন। কালো কষ্টিপাথরের মত এদের গায়ের রঙ, তেমনি ছিল চুল—পুরুষদের দাড়ি-গোঁফের এমন প্রাচুর্য যে ভারতবর্ষের যে কোন শ্মশ্রুগুম্ফগরবীদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। মেয়েদের চুলও ছিল তেমনি—রুক্ষ কালো ঘন এক রাশ চুল, বৈশাখের হাওয়ায় ফুলতে থাকত দ্রুত ধাবমান কালো মেঘের মত। তেমনি টিকলো নাক, আর তীক্ষ্ণ চোখ।

ওদের গানের দু-একটা মনে আছে।

ও কালীলাগ ডংসেছে লখাকে—বাসর ঘরেতে
বেউলা কাঁদে পতির শোকে পড়ে ধূলাতে।
কালী—লা—গ।

আর একটা গান—

কালিদহের ও লাগিনী ফুঁসিস না—এমন করে ফুঁসিস না।
ও তারে—দেখলে লাজের মাথা খাবি, তাও কি মরণ বুঝিস না।
ও লাগিনী ফুঁসিস না।

কালো কেউটে সাপ অত্যন্ত হিংস্র। মানুষকে এরা তাড়া ক'রে কামড়ায়। অবশ্য এর ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। একটি কেউটে সাপের সঙ্গে আমার এক সময় নিত্য দেখা হত। কিন্তু সে কখনও মাথা তোলে নি। সাড়া পাওয়া মাত্র চলে যেত। কিন্তু সাধারণ ভাবে কেউটের স্বভাব হিংস্র এবং এরা তাড়া করে যায় মানুষকে। আমিও তাড়া খেয়েছি অন্য কেউটের দু-চার বার। এই বেদেরা আশ্চর্য! এরা তাড়া করে ধরে এইসব সাপ। দেখেছি বেদের

মেয়ে বর্ষায় ধানভরা ক্ষেতের মধ্যে ছুটে চলেছে। আশ্চর্য হয়েছি। কি ব্যাপার! তারপরই দেখেছি প্রকাণ্ড একটা কেউটের মুখ মুঠিতে ধরে অন্য হাতে লেজটা টেনে ধরে আক্রোশভরে সাপটাকে বলছে—আমার হাত থেকে, যমের হাত থেকে, তু পালাবি? মাত্র হাত দেড়েক লম্বা একটা পাচনি ছড়ি হাতে নিয়ে—সদ্য ধরা সাপটাকে ছেড়ে দিয়ে হাঁটু দুলিয়ে নাচতে দেখেছি, গাইতে শুনেছি, "ও নাগিনী ফুঁসিস না।"

প্রশ্নাবলী

।। বিষয়গত প্রশ্ন ।।

১। "প্রচণ্ড জোরে হাঁক মারতেন—চেং চণ্ডী!"—কাহারা হাঁক দিতেন? "চেং চণ্ডী" কথাটির অর্থ কি?

২। মুসলমান ফকিরদের যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা নিজের ভাষায় লিখ।

৩। "গরুমারা" বলিতে কাহাদের বোঝায়? "আমার মনের মধ্যে আজও ছাপ কেটে রয়েছে প্রথম 'গরুমারা'র ছবি।"—নিজের ভাষায় ঐ ছবির বর্ণনা দাও।

৪। পটুয়া বলিতে কাহাদের বোঝায়? দ্বিজপদ পটুয়ার পরিচয় দাও।

৫। বেদিয়া পুরুষ ও নারীদের চেহারার বর্ণনা দাও। তাহাদের জীবিকা অর্জনের উপায় কি ছিল?

৬। বেদিনীদের দুঃসাহসের যে কথা লেখক বলিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে লিখ।

৭। "ও কালীনাগ ডংসেছে লখাকে—বাসর ঘরেতে—
বেউলা কাঁদে পতির শোকে প'ড়ে ধুলাতে।"
—"লখা বেউলা" কাহিনীটি সংক্ষেপে বল।

৮। প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা কর :

অকস্মাৎ মানুষের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেলে যে উদ্বেগ তার বুকখানাকে তোলপাড় করে তোলে—সেই অসহনীয় উদ্বেগ আমার শিশুচিত্তকে অধীর অস্থির করে তুলেছিল। আমি সমস্ত দিন কেঁদেছিলাম।

৯। টীকা লিখ :

বাউল, পদাবলী, চণ্ডী, বৈষ্ণব, শাক্ত, গাজী, মুস্কিল আসান, পটুয়া, বেদিয়া, আল-কেউটে, পীরমঙ্গল।

॥ ব্যাকরণগত প্রশ্ন ।

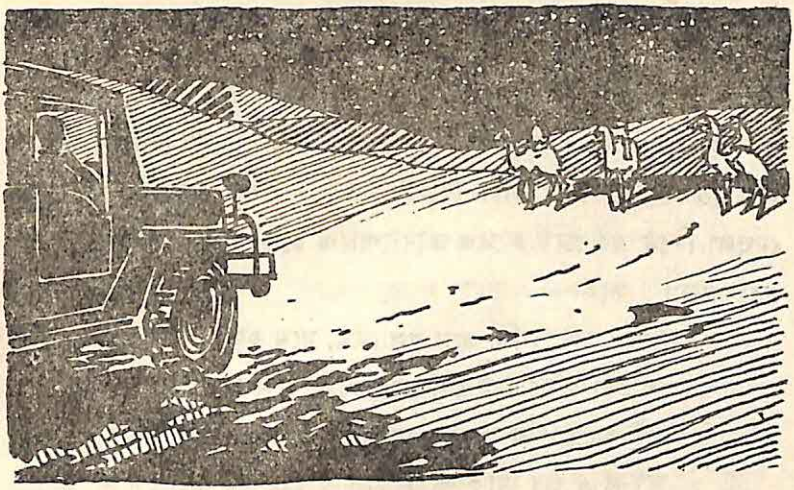
১০। নিম্নোক্ত শব্দগুলির সাহায্যে সার্থক বাক্য রচনা কর :
বয়েৎ, কীর্তন, কণ্ঠরুদ্ধ, টিকলো, ধানভরা।

১১। ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম লিখ :
পদাবলী, ভক্তিপুলকিত, তেঁতুলবীচি, শ্মশ্রুগুম্ফগরবী, কণ্ঠরুদ্ধ।

১২। নিম্নোক্ত পদগুলিতে 'ণ' বা 'ষ' কেন হইয়াছে বল :
বিষ্ণু, বিষ, মরণ, পুরুষ, কণ্ঠ, বর্ষা।

১৩। পদান্তর কর :
গায়ক, সন্ন্যাসী, সঙ্গিনী, বেদে।

Some early interesting memories of the author



চন্দ্রালোকে মরুভূমি ও রাতের কাইরো

॥ সৈয়দ মুজতবা আলি ॥

[সৈয়দ মুজতবা আলি (জন্ম—১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯০৪ ; মৃত্যু—১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪) বহু-ভাষাবিদ সুপণ্ডিত ছিলেন। দেশবিদেশের নানা বিদ্যালয়ে অধ্যাপনাও করেন। তিনি ছিলেন বিশ্বপথিক। বহু দেশে তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন। চন্দ্রালোকিত মরুভূমি এবং রাতের কাইরোর যে মূর্তিটি বিদগ্ধ রসিক লেখকের চোখে ধরা দিয়াছিল তাহারই মনোজ্ঞ বর্ণনায় উজ্জ্বল এই সংক্ষিপ্ত রচনাটি।]

...বন্দর ছেড়ে মরুভূমিতে ঢুকে গিয়েছি। পিছনে তাকিয়ে দেখি শহরের বিজলি বাতি ক্রমেই নিষ্প্রভ হয়ে আসছে—বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরনো স্মৃতি যে রকম আবছায়া-আবছায়া হতে থাকে।

মরুভূমির উপর চন্দ্রালোক। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। সে দৃশ্য বাঙলাদেশের সবুজ শ্যামলিমার মাঝখানে দেখা যায় না। তবে যদি কখনো পদ্মার বিরাট বালুচরে পূর্ণিমা-রাত্রে বেড়াতে যাও—রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই যেতেন এবং 'নিশীথে' গল্প তারই পটভূমিতে লেখা—তাহলে তার খানিকটা আস্বাদ পাবে।

সমস্ত ব্যাপারটা কেমন ভূতুড়ে ব'লে মনে হয়। চোখ চলে যাচ্ছে দূর দিগন্তে, অথচ হঠাৎ যেন ঝাপসা আবছায়া পর্দায় ধাক্কা

খেয়ে থেমে যায়। মনে হয়, যেন দেখতে পাচ্ছি, তবু ঠিক চিনতে পারছিনে। চতুর্দিকে ফট্ ফটে জ্যোৎস্নার আলো যেন উপছে পড়ে; মনে হয় এ আলোতে লাল-কালোর তফাত যেন ঘুচতে চায় না। মেঘলা দিনে এর চেয়ে অনেক ক্ষীণালোকে রঙের পার্থক্য অনেক বেশি ধরা পড়ে। তাই—

"মনে হল পাখি, মনে হল মেঘ, মনে হল কিশলয়,
ভালো ক'রে যেই দেখিবারে যাই মনে হল কিছু নয়।
দুই ধারে একি প্রাসাদের সারি, অথবা তরুর মূল ?
অথবা এ শুধু আকাশ জুড়িয়া আমারই মনের ভুল ?"

মাঝে মাঝে আবার হঠাৎ মোটরের দু-মাথা উঁচুতে ফুটে ওঠে জ্বল-জ্বল দুটি সবুজ আলো। ওগুলো কি ? ভূতের চোখ নাকি ? শুনেছি ভূতের চোখই সবুজ রঙের হয়। নাঃ! কাছে আসতে দেখি উটের ক্যারাভান—এ দেশের ভাষাতে যাকে বলে 'কাফেলা' (কবি নজরুল ইসলাম এ শব্দটি বাংলায় ব্যবহার করেছেন)। উটের চোখের উপর মোটরের হেডলাইট পড়াতে চোখ দুটো সবুজ হয়ে আমাদের চোখে ধরা দিয়েছে। দেশে গোরু-বলদের চোখে আলো প'ড়ে ঠিক এই রকমই হয়, কিন্তু বলদের চোখ যে লেভেলে দেখি উটের চোখ তার অনেক উপরে দেখতে পেলুম বলে এতখানি ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম।

আর কেনই বা পাব না বল। জনমানবহীন মরুভূমির ভিতর দিয়ে চলেছি, রাত্রিবেলা—আবার বলছি রাত্রিবেলা। মরুভূমির সম্বন্ধে কত গল্প, কত সত্য. কত মিথ্যে পড়েছি ছেলেবেলায়।

...মরুভূমিতে দিনের বেলা যেরকম প্রচণ্ড গরম, রাত্রেও তেমনি বিকট শীত। বৈজ্ঞানিকরা তার একটা অত্যুৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা দেন বটে, কিন্তু ধোপে সেটা কতখানি টেকে আমি যাচাই না করে বলতে পারব না। উপস্থিত শুধু এইটুকু বলতে পারি, জাহাজে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত দুঃসহ গরমে হাড়মাস যেন আচার হয়ে গিয়েছিল ; ঠাণ্ডা বাতাসের পরশ পেয়ে সর্বাঙ্গ যেন জলে-ভেজা জুঁই ফুলের মত ফুলে উঠল।

মরুভূমি পেরিয়ে কাইরো—মিশরের রাজধানী। অপরূপা। সত্যি, এরকম সৌন্দর্য সচরাচর চোখে পড়ে না। আমরা যখন চন্দননগর থেকে কলকাতা পৌঁছই তখন মাঝখানে ঘর বসতি আর বিস্তর জোরালো বাতি থাকে বলে কলকাতার রোশনাই ঠিকমত উপলব্ধি করতে পারিনে। এখানে মরুভূমি পেরিয়েই হঠাৎ শহর ব'লে একসঙ্গে সবকটা আলো চোখে প'ড়ে এক অদ্ভুত মরীচিকার সৃষ্টি করে।

ছ-তলা বাড়ির উপরে—অবশ্য বাড়িটা দেখা যাচ্ছে না—দেখি, লাল আলোতে জ্বালানো সেলাইয়ের কলের ছুঁচ ঘন ঘন উঠছে নামছে, আর সবুজ আলোর চাকা ঘুরেই যাচ্ছে ঘুরেই যাচ্ছে। নিচে এক বিলিতি কোম্পানির নাম। আরও কত রকমের প্রচলিত বিজ্ঞাপন।

…শহরতলীতে ঢুকলুম। কলকাতার শহরতলী রাত এগারোটায় অঘোরে ঘুমোয়। কাইরোর সব চোখ খোলা। খোলা জানালা দিয়ে সারি সারি আলো দেখা যাচ্ছে। আর রাস্তার কথা বাদ দাও। এই শহরতলীতে কত না রেস্তোরাঁ, কত না 'কাফে' খোলা। খদ্দেরে খদ্দেরে গিস্ গিস্ করছে।

আবার বলছি রাত তখন এগারোটা। আমি বিস্তর বড় শহর দেখেছি, কাইরোর মত নিশাচর শহর কোথাও চোখে পড়ে নি।

প্রশ্নাবলী ?

।। বিষয়গত প্রশ্ন ।।

১। চন্দ্রালোকিত মরু এবং রাতের কাইরোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

২। 'নিশাচর' কথাটির অর্থ কি? কাইরোকে 'নিশাচর শহর' বলা হয়েছে কেন?

৩। এই রচনার অন্তর্গত কবিতাংশটি মুখস্থ বল।

৪। শব্দার্থ লেখ : কাফেলা, রোশনাই, দুঃসহ।

৫। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লেখ :

(ক) মনে হল পাখি…আমারই মনের ভুল ?

(খ) জাহাজে দিনের পর দিন… …জুঁই ফুলের মত ফুলে উঠল।

(গ) আমি বিস্তর বড় শহর… …কোথাও চোখে পড়ে নি।

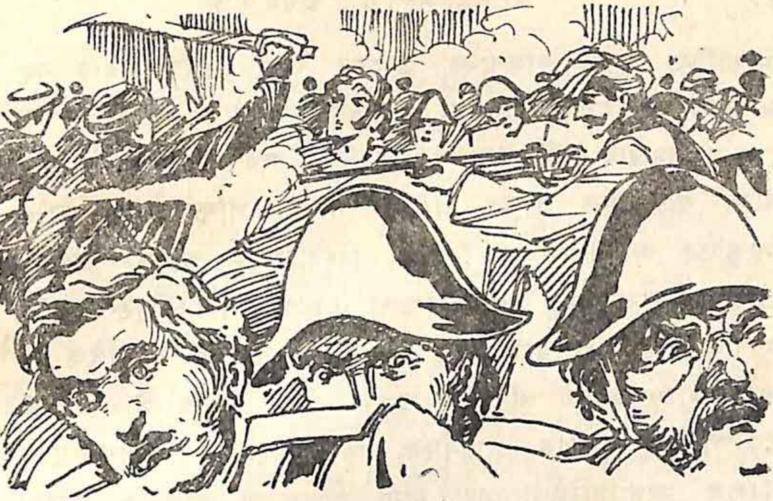
॥ ব্যাকরণগত প্রশ্ন ॥

৬। স্বরচিত বাক্যে প্রয়োগ কর : নিষ্প্রভ, জনমানবহীন, উপলব্ধি, প্রজ্বলিত, পটভূমি।

৭। পদ পরিবর্তন কর : আস্বাদ, ব্যাপার, ভয়, স্মৃতি, উপস্থিত, শ্যামলিমা।

৮। সন্ধিবিচ্ছেদ কর : চন্দ্রালোকে ; দিগন্ত ; চতুর্দিক ; অত্যুৎকৃষ্ট ; সর্বাঙ্গ।

A beautiful description of a travel through the desert to Cairo.



সিপাহী বিদ্রোহ

॥ চণ্ডিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

[অধ্যাপক শ্রীচণ্ডিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক কালের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক ও সুলেখক। তাঁহার "সিপাহী বিদ্রোহ" নামে গ্রন্থ হইতে এই প্রবন্ধটি উৎকলিত।]

১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতে যে প্রচণ্ড সশস্ত্র বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, ইতিহাসে তাহা সাধারণভাবে সিপাহী বিদ্রোহ বলিয়া কথিত হয়। তবে উহার প্রকৃত চরিত্র ও স্বরূপ আজও নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে নির্ণীত হয় নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার দুইটি রূপ ছিল—সামরিক বিদ্রোহ ও গণ-বিক্ষোভ।

সাধারণভাবে ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে ১৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পিছনে চারটি বিভিন্ন কারণ বিদ্যমান দেখা যায়—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয়। লর্ড ড্যালহৌসী-অনুসৃত ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের নীতি, মোগল সম্রাটদের বংশধরদের প্রতি অসম্মানজনক ব্যবহার, পেশোয়ার দত্তক-পুত্র নানা সাহেবের বৃত্তির বিলোপসাধন ইত্যাদি রাজনৈতিক কারণভুক্ত। কিছু সংখ্যক ভূস্বামীদের উচ্ছেদ, সাতারা নাগপুর প্রভৃতি রাজ্যের বিলুপ্তির ফলে বহু ব্যক্তির কর্মচ্যুতি, ড্যালহৌসী

নিয়োজিত ইনাম কমিশনের তদন্তের ফলে দাক্ষিণাত্যের বহু জমিদারী বাজেয়াপ্ত হওয়া এবং অযোধ্যা অধিকারের ফলে ব্যাপক বেকার সমস্যার সৃষ্টি ইত্যাদি বিদ্রোহের অর্থনৈতিক পটভূমিকা রচনা করিয়াছিল সন্দেহ নাই। আবার পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ও বিস্তৃতি, বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্তন, খ্রীষ্টান মিশনারীদের উগ্র তৎপরতা এবং সর্বোপরি চর্বিযুক্ত কার্তুজ সংবলিত এনফিল্ড রাইফেলের প্রবর্তন বিদ্রোহের সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ হিসাবে পরিগণিত হয়। ইহা ছাড়াও ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সামরিক বাহিনীতে ভারতীয় সৈন্য বা সিপাহীদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং নানা সংগত ও কাল্পনিক কারণে তাহাদের মধ্যে অসন্তোষের ক্রমবিস্তৃতি সামরিক বিদ্রোহের অব্যবহিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছিল, ইহাও অনস্বীকার্য। হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীরা তখন ছিল খুবই ধর্মভীরু এবং ধর্মসচেতন। খ্রীষ্টান ব্রিটিশ সরকার ছলে ও কৌশলে তাহাদিগকে ধর্মভ্রষ্ট করিতে সচেষ্ট হইয়াছে, এ ধারণাও তাহাদের মধ্যে প্রবল ছিল।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের শেষে ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডের বিক্ষোভ যে বিদ্রোহের ইঙ্গিত দিয়াছিল তাহার পূর্ণ আত্মপ্রকাশ হইল ঐ বৎসরের ১০ই মে তারিখে মীরাটে। মীরাটের সশস্ত্র অভ্যুত্থান প্রথমেই ছড়াইয়া পড়িল মোগল রাজধানী দিল্লীতে এবং সেখানে সমস্ত রাজকীয় মহিমা হইতে বিচ্যুত বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করা হইল। দিল্লী হইতে সিপাহী বিদ্রোহের আগুন তদানীন্তন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, মধ্য ভারত ও বিহারের অংশ বিশেষে ছড়াইয়া পড়িল। বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থলগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে দিল্লী, কানপুর, লখ্নৌ, বিহারের জগদীশপুর এবং মধ্য ভারতের ঝাঁসী। নানাসাহেব, আজমউল্লা, তাঁতিয়া টোপী, লক্ষ্মীবাঈ, কুমার সিং, বেগম হজরৎমহল, মৌলবী আহম্মদউল্লা, খান বাহাদুর খাঁ ইত্যাদি প্রথম সারির নেতৃবৃন্দের সহিত যোগ

দিলেন শঙ্করপুরের বেণীমাধব, সুবাদার বখ্‌ত্‌ খাঁ, শাহজাদা ফিরোজ শাহ, নানাসাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র রাওসাহেব ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত অখ্যাত অথচ দুর্ধর্ষ নেতা।

বিদ্রোহের প্রথম হইতেই নববিজিত পাঞ্জাব ইহার আওতার বাহিরে ছিল, অনেকটা সেখানকার শাসনকর্তা স্যার জন লরেন্সের চেষ্টায় এবং শিখ ও বিদ্রোহীদের মধ্যে সম্প্রীতির অভাবের জন্য। ফলে ইংরেজ সেনারা শিখ সৈন্যের নিকট হইতে যে সহযোগিতা লাভ করিয়াছিল, দিল্লীর পুনরধিকার (সেপ্টেম্বর ২৪, ১৮৫৭), এবং পরিশেষে বিদ্রোহের দমন তাহারই ফলে সম্ভব হয়। নেপালের মন্ত্রী জংবাহাদুর এবং তাঁহার গুর্খা সৈন্যের সামরিক সাহায্যও বিদ্রোহী-দের পরাজয় ত্বরান্বিত করে। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে লখনৌ পুনরধিকারের পরই হয়তো বিদ্রোহের অবসান ঘটিত, কিন্তু এই সময় ভাইসরয় লর্ড ক্যানিং একটি অবিজ্ঞোচিত ঘোষণা করিয়া ফেলেন যে, রাজভক্ত ব্যতীত তালুকদারের ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে। ইহার ফলে উত্তরপ্রদেশের তালুকদাররা বিদ্রোহে যোগ দেয় এবং যুদ্ধ আরও কয়েকমাস অব্যাহত থাকে।

এই বিদ্রোহে ভারতীয় পক্ষ কয়েকটি ক্ষেত্রে নৃশংসতা প্রদর্শন করিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার দ্বারা কুমার সিং, লক্ষ্মীবাঈ, তাঁতিয়া টোপী ও মৌলবী আহম্মদউল্লার মত নেতাদের শৌর্য ও প্রগাঢ় দেশানুরাগের মহিমা কোনও মতে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না। মৌলবীর দেশানুরাগ ও মহানুভবতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মালেসনের শ্রদ্ধা নিবেদনের সঙ্গে রাণী লক্ষ্মীবাঈ সম্বন্ধে ব্রিটিশ সেনাপতি হিউ রোজের প্রশস্তিবাক্য স্বতঃই তুলনীয়। আর কানপুরের নৃশংসতাকে ম্লান করিয়া দিয়াছিল ইংরেজ সেনাপতি হড্‌সন ও নীলের অমানুষিক কার্যকলাপ। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ, যাহা কোনও কোনও অঞ্চলে গণবিদ্রোহের রূপ লইয়াছিল, ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাহা মারাঠা নায়ক তাঁতিয়া টোপীর প্রাণদণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে পরিসমাপ্ত হয়। তাহার পূর্বেই ১৮৫৮

খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মহারাণীর ঘোষণায় বিদ্রোহের আনুষ্ঠানিক অবসান সূচিত হয়। ঐ ঘোষণায় ভৌমিক সম্প্রসারণ নীতি, ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের নীতি এবং কর্মনিয়োগ ব্যাপারে সমস্ত প্রকার বৈষম্যের নীতি বর্জন করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। তাহারও পূর্বে (আগস্ট, ১৮৫৮ খ্রীঃ) ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একটি আইনের দ্বারা ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিলোপসাধন করা হয় এবং ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট তথা মহারাণী স্বয়ং ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন। ইহাই হইল ১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের রাজনৈতিক পরিণাম।

এই বিদ্রোহ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিকে নাড়া দিলেও শেষ পর্যন্ত সফল হইতে পারে নাই। ইহার প্রধান কারণ সামরিক। অস্ত্রবল, রণনৈপুণ্য, রাজনীতি এবং বহিরাগত সাহায্য সব দিক্ দিয়াই যে ইংরেজ সৈন্য ভারতীয় সিপাহীদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর শিক্ষা, অধিকতর অভিজ্ঞতা ও সুযোগ-সুবিধার অধিকারী ছিল তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। ইংরেজ সৈন্যের সংঘবদ্ধতা, ঐক্য ও দেশপ্রেম তাহাদিগকে প্রেরণা ও বল জোগাইয়াছিল। পক্ষান্তরে, ভারতীয় নেতাদের মধ্যে কোনও পূর্ব-পরিকল্পিত সমরনীতি ছিল না, এমন কি সম্ভবতঃ যোগাযোগও ছিল না। সমগ্র দেশের মাত্র কিছু কিছু অংশ বিদ্রোহে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করিয়াছিল, বাকি অংশ হয় ছিল নিশ্চেষ্ট, নয় ইংরেজের অনুকূলে। গোয়ালিয়র, হায়দ্রাবাদ, নেপাল এবং শিখেরা সকলেই ইংরেজের পক্ষে ছিল। তাই সিপাহী বিদ্রোহ কোনও কোনও স্থানে জনসংগ্রামের রূপ গ্রহণ করিলেও এবং ইহার নেতৃবৃন্দের মধ্যে শৌর্যবান দেশভক্ত বীরের অভাব না থাকিলেও শেষ পর্যন্ত ইহা বিফল হয়।

প্রশ্নাবলী

।বিষয়গত প্রশ্ন।।

১। কোন্ ঘটনাকে সাধারণভাবে 'সিপাহী বিদ্রোহ' বলা হয়?

২। সিপাহী বিদ্রোহের পিছনে কোন্ চারিপ্রকার কারণ দেখা যায়? কারণগুলি বিশদভাবে উল্লেখ কর। এই চারিপ্রকার কারণ ছাড়া আরও কি কোন কারণ ছিল?

৩। '১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের শেষে ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডের বিক্ষোভ যে বিদ্রোহের ইঙ্গিত দিয়াছিল, তাহার পূর্ণ আত্মপ্রকাশ হইল ঐ বৎসরের ১০ই তারিখে মীরাটে'—কোন্ বিদ্রোহের কথা বলা হইয়াছে? তাহার পূর্ণ আত্মপ্রকাশ কিভাবে হইয়াছিল?

৪। সিপাহী বিদ্রোহের কয়েকজন প্রথম সারির নেতার নাম উল্লেখ কর। ইঁহাদের সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ।

৫। সিপাহী বিদ্রোহের সময় কাহাদের কাছ হইতে ইংরেজরা সাহায্য পাইয়াছিল?

৬। লর্ড ক্যানিং কি অবিজ্ঞোচিত ঘোষণা করিয়াছিলেন? তাহার ফল কি হইয়াছিল?

৭। "মহারাণীর ঘোষণায় বিদ্রোহের আনুষ্ঠানিক অবসান সূচিত হয়।" —কোন্ বিদ্রোহের কথা বলা হইয়াছে? এই ঘোষণা দ্বারা কি ভাবে বিদ্রোহের আনুষ্ঠানিক অবসান সূচিত হয়?

মহারাণী কে? তিনি কি ঘোষণা করিয়াছিলেন?

৮। "ইহাই হইল ১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের রাজনৈতিক পরিণাম।" "ইহা" দ্বারা কোন্ ঘটনা বোঝান হইয়াছে?

৯। সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার প্রধান কারণগুলি বিশদভাবে বল।

১০। টীকা লেখ :

নীল, নানাসাহেব, তাঁতিয়া টোপী, লক্ষ্মীবাঈ।

১১। প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা লেখ :

(ক) প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার দুইটি রূপ ছিল—সামরিক বিদ্রোহ ও গণ-বিক্ষোভ।

(খ) তাই সিপাহী বিদ্রোহ কোনও কোনও স্থানে জনসংগ্রামের রূপ গ্রহণ করিলেও এবং ইহার নেতৃবৃন্দের মধ্যে শৌর্যবান দেশভক্ত বীরের অভাব না থাকিলেও শেষ পর্যন্ত ইহা বিফল হয়।

১২। অর্থ লেখ :

গণ-বিক্ষোভ, ভূস্বামী, কর্মবিস্তৃতি, সম্প্রীতি, অবিস্ফোরিত, অব্যাহত, মহানুভবতা, গণসংগ্রাম।

॥ **ব্যাকরণগত প্রশ্ন** ॥

১৩। পদান্তর কর :

প্রস্তাব, বিক্ষোভ, অনুসৃত, কর্মচ্যুতি, প্রদর্শন, মহানুভবতা, পরিসমাপ্ত ॥

১৪। ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম লেখ—

দৃষ্টিকোণ, ভূস্বামী, নববিজিত, ভূসম্পত্তি, ত্বরান্বিত।

১৫। সন্ধিবিচ্ছেদ কর :

সর্বোপরি, অভ্যুত্থান, পুনরধিকার, দেশানুরাগ, নিশ্চেষ্ট।

The Story of Sepoy mutiny



শ্রমের মর্যাদা

॥ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ॥

[আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (জন্ম—২ আগস্ট, ১৮৬১ ; মৃত্যু - ১৬ জুন, ১৯৪৪) একাধারে ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও সমাজসংস্কারক। তিনি ছিলেন নিরহঙ্কার, দেশহিতব্রত, জ্ঞানতাপস। বাণিজ্যবিমুখ বাঙালীকে বাণিজ্যমুখী করিয়া তুলিবার জন্য তিনি সুবিখ্যাত প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বহু বৎসর পূর্বে বাঙালীর আর্থিক তথা শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি যেসব মন্তব্য করিয়া গিয়াছেন, আজও তাহা নানা ক্ষেত্রে সত্য।]

আমি বাঙালী, এজন্য গর্ব অনুভব করি। এক শতাব্দী পূর্বে এক সময় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় জ্ঞানবর্তিকা লইয়া স্বদেশবাসীদিগকে উন্নতির পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেই দিন হইতে বাঙালী অন্ততঃ বুদ্ধির ক্ষেত্রে ভারতবাসীর মধ্যে অগ্রণী। আশা করি বাঙালী এই গৌরব রক্ষা করিতে পারিবে। কিন্তু এক অন্ন সমস্যার সমাধান করিতে না পারিয়া বাঙালী জাতি লয়প্রাপ্ত হইতে চলিয়াছে। এই ধ্বংসোন্মুখ জাতিকে রক্ষা পাইতে হইলে জাতিগত দোষ সকল পরিহার করিতে হইবে।

বাঙালী অলস, শ্রমবিমুখ, ফন্দিবাজ ও ফাঁকিদার। এই কারণে বাঙালী একে একে সমস্ত ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পবিভাগ হইতে বিতাড়িত হইতেছে। কসাইটোলা (বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট) হইতে আরম্ভ করিয়া ফৌজদারী বালাখানা পর্যন্ত রাস্তার দুইধারে চীনা জুতার মিস্ত্রী। মুর্গীহাটার দুইধারে দিল্লীওয়ালা সওদাগরদের আস্তানা। ইহারা বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকার বিলাতী দ্রব্য, যথা—মনোহারী, বিস্কুট, জমাট দুধ ও নানাবিধ ঔষধ ইত্যাদি আমদানি করে। তাহার পর বড়বাজার মাড়োয়ারী ও ভাটিয়া ধনকুবেরদিগের একচেটিয়া। এতদ্ভিন্ন এজরা ষ্ট্রীট, পোলক ষ্ট্রীট প্রভৃতি স্থান আর্মানী ও ইহুদী সওদাগরদিগের প্রধান আড্ডা। আর ইংরেজদের তো কথাই নাই। ক্লাইভ ষ্ট্রীট হইতে আরম্ভ করিয়া বরাবর লালবাজার দিয়া দক্ষিণ দিকে গেলে চৌরঙ্গিতে পৌঁছান যায়। দুইধারে বড় বড় ব্যাঙ্ক, হৌস ও ইংরেজদিগের বিশাল বিপণিশ্রেণী বিদ্যমান।

এই তো গেল উচ্চ স্তরের কথা। নিম্ন স্তরে কথা আসিলেই দেখা যায় যে কলিকাতায় যত মজুর ও শ্রমজীবী আছে, তাহারা প্রায়ই হিন্দুস্থানী ও উড়িয়া। কলিকাতার লোকসংখ্যা যত তাহার প্রায় অর্ধেক অবাঙালী। আমরা কলিকাতা নগরীকে এসিয়ার শ্রেষ্ঠ নগরী বলিয়া গর্ব অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু বেল পাকিলে কাকের কি? কলিকাতায় যে অগাধ ধনরাশির আদান-প্রদান হয়, তাহার শতকরা ৯৫ ভাগ বাঙালীর হাতছাড়া। বাঙালী ছুতার ও কাঠের গোলাওয়ালাদের চীনারা তাড়াইতেছে। কলিকাতায় পান, চুরুট, লেমনেড ও শরবতের দোকান একটিও বাঙালীর নহে। ভাল ও কর্মঠ করাতী ও আড়কুসী সব কচ্ছদেশীয়।

সকল শ্রেণীর বাঙালী আজ জীবন-সংগ্রামে হটিয়া যাইতেছে। আর অন্যেরা আসিয়া তাহাদের স্থান দখল করিতেছে। সকল জাতি ও শ্রেণী এই কলিকাতায় দু'পয়সা রোজগার করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কাটাইতেছে। বাঙালীই কেবল "হা অন্ন! হা অন্ন!" করিয়া জীর্ণশীর্ণ ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়িতেছে। ইহাতে বাঙালী জাতির

অনেক দোষ আসিয়া স্পর্শিতেছে। কথায় বলে অভাবে স্বভাব নষ্ট। বাঙালীর মত পরপ্রত্যাশী ও পরভোগ্যোপজীবী আর কোন জাতি নাই। একজন রোজগারক্ষম হইলে দশজন ভূতের মত তাহার ঘাড়ে চাপিয়া বসিবে। বাঙালী কেরানীগিরি, স্কুলমাস্টারি ও ওকালতি ছাড়া আর কিছু শিখিলও না, বুঝিলও না। মফস্বলেও এই দশা।

বাঁচিতে হইলে নিজেদের দোষ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ইংরেজ, চীনা, মাড়োয়ারী, প্রভৃতি যে সকল গুণে ব্যবসায় ক্ষেত্রে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছে, তাহা শিক্ষা করিতে হইবে। একনিষ্ঠ হইয়া, আলস্য পরিত্যাগ করিয়া কাজ করিতে হইবে। অকৃতকার্য হইলেও ধৈর্য ধরিয়া কাজ করিয়া যাইতে হইবে। শ্রমের মর্যাদা শিখিতে হইবে। নিজে মোট বহিয়া ও দাঁড়ি-পাল্লা ধরিয়া ব্যবসায় শিখিতে হইবে। যে আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হইতে চাহে ও রাতারাতি বড়লোক হইতে চাহে, তাহার দ্বারা ব্যবসায় হইবে না।

প্রশ্নাবলী

॥ বিষয়গত প্রশ্ন ॥

১। রাজা রামমোহন রায় কি করিয়াছিলেন? লেখক যাহা আশা করিতেছেন বাঙালী জাতি কেন সেই আশা পূরণ করিতে পারিতেছে না?

২। বাঙালীর কি কি দোষের কথা লেখক বলিয়াছেন? ব্যবসা-বাণিজ্য হইতে বাঙালী বিতাড়িত হইতেছে কেন?

৩। কলিকাতার শ্রমজীবীদের অধিকাংশ কাহারা? আমরা কোন্ নগরীকে এশিয়ার শ্রেষ্ঠ নগরী বলিয়া গর্ব অনুভব করি?

৪। "বেল পাকিলে কাকের কি?"—কি প্রসঙ্গে লেখক ঐ মন্তব্য করেন? ইহার তাৎপর্য কি?

৫। বাঙালী কি কি পেশা ছাড়া আর কিছু শিখিতে পারিল না? ব্যবসায়ে কৃতিত্ব দেখাইতে হইলে বাঙালীকে কি কি গুণ অর্জন করিতে হইবে?

৬। প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা কর : "বাঙালীই কেবল হা অন্ন! হা অন্ন! করিয়া জীর্ণশীর্ণ ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়িতেছে।"

৭। টীকা লেখ : রামমোহন রায়, মুর্গীহাটা, বড়বাজার, চৌরঙ্গি, "আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ"।

।। ব্যাকরণগত প্রশ্ন ।।

৮। নিম্নোক্ত শব্দগুলির সাহায্যে এক একটি সার্থক বাক্য রচনা কর :
মহাত্মা, অন্নসমস্যা, দিল্লীওয়ালা, রোজগারক্ষম, একনিষ্ঠ।

৯। ব্যাসবাক্য-সহ সমাস লেখ :
মহাত্মা, জ্ঞানবর্তিকা, শ্রমবিমুখ, বিপণিশ্রেণী, শ্রমজীবী, জীবনসংগ্রাম, অকৃতকার্য।

১০। সন্ধিবিচ্ছেদ কর :
ধ্বংসোন্মুখ, পরভোগ্যোপজীবী।

Dignity of labour and secret to success in trade



বসন্তের টিকা ও জেনার

॥ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥

[লেখক স্বর্গত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ছিলেন কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য অধ্যাপক ভট্টাচার্য শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি বহু বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধ সরল বাংলা ভাষায় সরসভাবে রচনা করিয়াছেন।]

বসন্ত রোগটা আকছার লোকের মধ্যে দেখা দিত। কেউ বাঁচত, কেউ মরত। লোকে রোগ হওয়া-না-হওয়াটা মনে করত বিধির বিধান, ভাগ্যের ব্যাপার। প্রত্যেক লোক ভয়ে অস্থির হত, কাকে কখন ওই রোগে ধরে। রোগের আক্রমণ থেকে যারা বেঁচে উঠত তাদের দেহের শ্রী নষ্ট হয়ে যেত। আজ বিজ্ঞান ওই রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী। সেই জয়ের ইতিহাস যেমন চমকপ্রদ তেমনি কৌতূহলকর।

জেনার তখন চিকিৎসা-বিদ্যালয়ের একজন ছাত্র। ছাত্রাবস্থায়ও তিনি ভাবতেন কি করে বসন্ত রোগের আক্রমণ থেকে মানুষকে বাঁচান যায়। এই সময়ে তিনি লক্ষ্য করেন, যে সকল গোয়ালিনী দুধ দেয় তাদের হাতে দু-একটি গো-বসন্তের গুটি হয়। কিন্তু জেনার আরও লক্ষ্য করলেন যে গো-বসন্তের ওই গুটি হাতেই সীমাবদ্ধ

থাকে, শরীরের আর কোন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে না। এমন কি বসন্তের মড়কের সময়ও না।

জেনার এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করলেন। ষোল বছর পরে নানারকম পরীক্ষা করে শেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, গো-বসন্তের টিকা নিলে আর বসন্ত হবে না। ব্যাপারটা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হবার পর ১৭৮৮ সালে তিনি তাঁর আবিষ্কারের কথা প্রকা॰ করলেন। প্রথমে সাধারণ লোক ও ডাক্তাররা জেনারকে নিয়ে বিদ্রূপ আরম্ভ করে দিল। ব্যঙ্গচিত্র বের হল, গো-বসন্তের টিকা দেওয়ার ফলে মানুষের মুখ গরুর মুখ হয়ে গিয়েছে, মাথায় শিং গজিয়েছে। জেনার তাঁর পরীক্ষার বিবরণী রয়াল সোসাইটিতে পাঠালেন, রয়াল সোসাইটি থেকে তা অমনোনীত হয়ে ফেরৎ এল।

কিন্তু জেনার এতে নিরুৎসাহ হলেন না। তিনি 'সারা নেলমিস' নামে এক গোয়ালিনীর হাতের গো-বসন্ত থেকে বীজ নিয়ে জেম্‌স্ ফিপ্‌স্ নামের একটি আট বৎসরের ছেলেকে প্রথম টিকা দেন। চারদিকে তখন বসন্ত হচ্ছে, কিন্তু দেখা গেল ছেলেটির বসন্ত হল না। সেটা ছিল তাঁর প্রথম পরীক্ষা। জেনারের এখন আর কোন সন্দেহই রইল না যে, তিনি মানবজাতিকে এক ভয়াবহ ব্যাধির হাত থেকে মুক্ত করবার উপায় বের করতে পেরেছেন। তিনি তাঁর নিজের ছেলেকে টিকা দিলেন। নিকটে একটা গ্রামে অনেক গরীব লোক বাস করত, জেনার তাদের সকলকে টিকা দিয়ে দিলেন। লোকে দেখল সে পাড়ায় আর কারও বসন্ত হল না। তখন ধীরে ধীরে লোকে জেনারের মতে আস্থাবান হতে থাকল।

জেনার নেপোলিয়ানের বিশেষ প্রিয়পাত্র হলেন, নেপোলিয়ান নিজেও টিকা নিলেন। একবার যুদ্ধ-বন্দী দু'জন ইংরেজকে দেশে ফিরিয়ে দেবার জন্যে জেনার নেপোলিয়ানের কাছে আবেদন করেন। নেপোলিয়ান দরখাস্তখানা না-মঞ্জুর করতে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল যে, দরখাস্তখানা এসেছে টিকার

আবিষ্কারকের কাছ থেকে। নেপোলিয়ান তৎক্ষণাৎ—"ঐ ব্যক্তিকে অদেয় আমার কিছু নেই", বলে লোক দুজনকে ছেড়ে দিলেন।

জেনার তাঁর আবিষ্কারের কথা বাইরে প্রকাশ করে দিলেন। পৃথিবীর নানা স্থান থেকে নানা প্রশ্ন আসতে লাগল, তিনি যথাযথ উত্তর দিতে থাকলেন, তাঁর পদ্ধতি সকলকে বুঝিয়ে দিলেন, কারণ তাঁর একমাত্র কাজ ছিল সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ সাধন করা। তাঁর আবিষ্কারের ফলে, টিকা নেবার পর বসন্ত রোগে মৃত্যু পৃথিবীতে আর বড় দেখা গেল না। এখন অনেক দেশ আইন করে টিকা নেওয়াটা বাধ্যতামূলক করেছে।

প্রশ্নাবলী

।। বিষয়গত প্রশ্ন ।।

১। ডাক্তার জেনার কিভাবে বসন্ত রোগের টিকা আবিষ্কার করেন? আবিষ্কারের ঘটনাটা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

২। বসন্ত রোগের ভয়াবহতা বর্ণনা কর।

৩। এই প্রবন্ধে ডাক্তার জেনারের মানব প্রেমের যে পরিচয় পাইলে তাহা বর্ণনা কর।

৪। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর ঃ

নেপোলিয়ান তৎক্ষণাৎ········ছেড়ে দিলেন।

৫। শব্দার্থ লেখ ও বাক্যরচনা কর ঃ

নামঞ্জুর, ব্যঙ্গচিত্র, আবিষ্ক্রিয়া, অদেয়, কল্যাণ, বিধির বিধান, আকছার।

॥ সংক্ষিপ্ত বস্তুমুখী প্রশ্ন ॥

৬। সংক্ষেপে উত্তর কর :

(ক) টিকা আবিষ্কারের পূর্বে কোন্ ঘটনাটি জেনারকে ভাবিত করে ?

(খ) জেনার কবে তাঁর আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন ?

(গ) গোয়ালিনীর নাম কি ছিল ?

(ঘ) জেনারকে বিদ্রূপ করে কিরূপ ব্যঙ্গচিত্র বের হয়েছিল ?

(ঙ) ষোল বছরের পরীক্ষানিরীক্ষার পর জেনার কি সিদ্ধান্তে আসেন ?

(চ) জেনার কাকে প্রথম টিকা দেন ?

(ছ) নেপোলিয়ান কি বলেছিলেন ?

(জ) জেনারের আবিষ্কারের কথা গোপন না করার কারণ কি ?

Stay of a scientific discovery



স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বাঘা যতীন

॥ মণি বাগচি ॥

[শ্রীমণি বাগচি বর্তমান কালের এক খ্যাতনামা জীবনীকার। "বাঘা যতীন" তাঁহার একটি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ।]

বিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রভাতে ঘুম ভাঙলে পরে বাঙালী দেখতে পেল যে বাংলার মানচিত্র ধীরে ধীরে বদলে যেতে আরম্ভ করেছে। নূতন নূতন দৃশ্যপট জেগে উঠেছে সেই মানচিত্রের উপরে। দেশের মাটিতে একে একে আবির্ভূত হয়েছেন নবযুগের সব নূতন মানুষ— তাঁদের ললাটে ত্যাগের বিভূতি, কণ্ঠে নূতন কথা, চক্ষে নূতন দৃষ্টি আর হৃদয়ে অপরিসীম আত্মবিশ্বাস। এঁদের মধ্যে চিন্তানায়ক, কবি, লেখক, রাজনীতিবিদ ও বিপ্লবী সবাই আছেন। আকাশে বাতাসে নূতন ভাব, নূতন সুর, নূতন গান। এই সবই যেন একত্র হয়ে একটা অগ্নিগর্ভ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিল। সুদূর ভবিষ্যৎ নয়, অতি আসন্ন ভবিষ্যৎ। বাঙালীর মনে লাগল নূতন রঙ—ইতিহাসের দিগন্ত উদ্‌ভাসিত হওয়ার উপক্রম হল যেন রঙের বিচিত্র ছটায়।

একটি নবযুগের উদ্বোধন হল শতাব্দীর প্রথম প্রভাতে। নবযুগ তখনই আসে যখন দেশের মধ্যে যুগপৎ ঘটে একটি মহত্তর আবির্ভাব আর বৃহত্তর ঘটনা। এ-ই ইতিহাসের নিয়ম।

বিংশ শতাব্দীর সূচনায় বাংলাদেশে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি এই রকম এক মহত্তর আবির্ভাব আর বৃহত্তর ঘটনা। অরবিন্দ ছিলেন সেই প্রত্যাশিত আবির্ভাব। আর স্বদেশী আন্দোলন ছিল সেই ঘটনা। অরবিন্দকে কেন্দ্র করেই সেদিন নব জাতীয়তার ভাব উত্তাল তরঙ্গ তুলে বয়ে গিয়েছিল বাংলার বুকে। আর সেই স্বদেশী আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করে জেগে উঠেছিল বাঙালীর অন্তরে দাসত্বশৃঙ্খল মোচনের জন্য একটি অদম্য অভীপ্সা। এই অভীপ্সার পথ দিয়েই বিস্ফোরণের মত দেখা দিয়েছিল আর একটি নূতন ভাব—বিপ্লববাদ। এই নবযুগের ফলশ্রুতিই ছিল সেই বর্ণাঢ্য অগ্নিযুগ।

বাঘা যতীন ছিলেন এই অগ্নিযুগেরই সন্তান।

একাধারে তিনি ছিলেন যোদ্ধা, নায়ক ও কুশলী সংগঠক।

অরবিন্দকে যদি আমরা বলি ক্ষত্রিয়ের রণগুরু তা হলে যতীন্দ্রনাথকে বলতে হয় সেনাপতি। অরবিন্দ যদি হন দ্রোণাচার্য, তা হলে যতীন্দ্রনাথকে বলতে হয় তাঁর সব্যসাচী শিষ্য। সাঁতার কাটা, চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়া, নক্ষত্রবেগে সাইকেল চালান, শিকার করা, বন্দুক রিভলবার ও পিস্তল চালান, মল্লযুদ্ধ, লাঠি ও ছোরা খেলা, বক্সিং—শারীরিক এসব ব্যাপারে তিনি ছিলেন সত্যই সব্যসাচী। তাঁর শিকারকে তিনি কখনও একটার বেশি দুটো গুলি মারতেন না—এমনি ছিল তাঁর হাতের অব্যর্থ সন্ধান। তেমনি তাঁর বজ্রমুষ্টি ঘুঁষির ওজন ছিল বিরাশি সিক্কা। সে ঘুঁষিতে অনেক ষণ্ডা গুণ্ডার নাক ভেঙেছে, কপাল ফেটেছে। সেই সঙ্গে তাঁর মনের বলও ছিল অসাধারণ। সেনাপতি-সুলভ প্রতিভা ছিল তাঁর। স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করে সহকর্মীদের অভ্রান্ত নির্দেশ দিতে পারতেন তিনি আর পারতেন তাদের উদ্বুদ্ধ করতে, বিপদের মুখে ঝাঁপ দিয়ে পড়বার জন্য সাহস ও উৎসাহ দিতে। সে দিন বাংলায় যে নবযুগ এসেছিল, সেই যুগের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়কে সার্থক করে তোলার জন্যে যেমন অরবিন্দের মত একজন সর্বত্যাগী ও দূরদর্শী ব্যক্তির নেতৃত্বের

প্রয়োজন ছিল, তেমনি প্রয়োজন হয়েছিল যতীন্দ্রনাথের মত একজন দুঃসাহসী বীরের সৈনাপত্য।

যতীন্দ্রনাথ যখন বাংলা সরকারের একজন বেতনভোগী কর্মচারী সেই সময় বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা। এই আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ফুটে উঠেছিলেন ভবিষ্যতের বিপ্লবী নায়ক বাঘা যতীন।...

অগ্নিযুগের ইতিহাসও এর সঙ্গে বিজড়িত। আবার সর্বভারতীয় রাজনীতি অর্থাৎ কংগ্রেসী রাজনীতিও এই আন্দোলনের দ্বারা সেদিন অনেক পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিল। কাজেই স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে প্রত্যেক বাঙালী সন্তানের পরিচয় থাকা দরকার। এই প্রয়োজন আজ বিশেষভাবে অনুভূত হয় এই জন্য যে, স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে ভারতবর্ষে আমরা রাজনীতির যে ব্যবসাদারি রূপটা লক্ষ্য করি, বিভিন্ন মতের ও বিভিন্ন দলের নেতাদের মধ্যে যে মনো-বৃত্তি লক্ষ্য করি তা দেখে হতাশ হতে হয়। বৃহত্তর রাজনৈতিক মতবাদ ও চিন্তাধারা, বর্তমান কালের রাজনৈতিক পরিবেশের গ্লানি ও ক্লেদ, অদূরদর্শিতা ও চাপল্য দেখে আমাদের কেবল এই কথাটাই মনে হয় যে, এঁরা রাজনীতি করেন বটে, কিন্তু এই দেশের রাজনৈতিক চিন্তার যে বনিয়াদ, এঁদের পায়ের তলায় আজ সেই বনিয়াদ নেই। 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'—এই সত্যটি হয় তাঁরা বিস্মৃত হয়েছেন, নতুবা জ্ঞানত অস্বীকার করেন। সব কিছুর উপরে দেশ—এই আদর্শটা আজ আমাদের সামনে অস্পষ্ট হয়ে এসেছে।

......প্রাণ যখন জাগে, তখন হিসাব করে জাগে না।

মানব সভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাসে যত রকমের জাগরণের সঙ্গে আমরা আজ পরিচিত, তার প্রত্যেকটি এইভাবে ঘটেছে। অন্তরের গূঢ় প্রেরণা ইতিহাসের জারকরসে জারিত হয়ে এই জাগরণকে হঠাৎ আমাদের সামনে নিয়ে আসে। বাংলার স্বদেশী আন্দোলন ছিল এমন একটি প্রাণ-জাগার কাহিনী। ইতিহাসের প্রত্যেক বৃহৎ

ও মহৎ ঘটনার মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে কার্য-কারণ সম্বন্ধ। এবং এই প্রক্রিয়া ভিন্ন কোন আন্দোলনই—তা সে সামাজিক আন্দোলন হ'ক, সাংস্কৃতিক আন্দোলন হ'ক কিংবা ধর্মীয় বা রাজনৈতিক আন্দোলন হ'ক—একটি যথার্থ আন্দোলন হিসাবে সার্থকতা লাভ করে না। সাময়িক উত্তেজনা আর উদ্দেশ্যমূলক আন্দোলন এক জিনিস নয়—দুটোর চরিত্র পৃথক ও পরিণতিও স্বতন্ত্র। বাংলার স্বদেশী আন্দোলন ছিল এমনি একটি উদ্দেশ্যমূলক ও পরিণাম-অন্বিত আন্দোলন, সাময়িক উত্তেজনা বা হুজুগমাত্র ছিল না।

প্রশ্নাবলী

॥ বিষয়গত প্রশ্ন ॥

১। বিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রভাতে যে নূতন নূতন দৃশ্যপট বাঙালীর চোখের সামনে জাগিয়া উঠিয়াছিল, লেখকের বর্ণনা অনুসারে তাহা বল।

২। "বিংশ শতাব্দীর সূচনায় বাংলাদেশে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি এই রকম এক মহত্তর আবির্ভাব আর এক বৃহত্তর ঘটনা"—কোন্ মহত্তর আবির্ভাব আর বৃহত্তর ঘটনার কথা এখানে বলা হইয়াছে?

৩। বাঘা যতীনের কি কি শারীরিক দক্ষতা ছিল? বাঘা যতীন তাঁহার শিকারকে কেন একটার বেশী দুটি গুলি মারিতেন না?

৪। নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা প্রসঙ্গে লেখক বাঘা যতীন সম্পর্কে কি মন্তব্য করিয়াছেন?

৫। বাংলাদেশে যখন স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হয়, তখন বাঘা যতীন কি কাজে নিযুক্ত ছিলেন?

৬। বর্তমান রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কি মনোবৃত্তি দেখিয়া লেখক হতাশ হইয়াছেন? স্বদেশী আন্দোলন কি সর্বভারতীয় রাজনীতিকে প্রভাবিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল?

৭। "সব কিছুর উপরে দেশ—এই আদর্শটা আজ আমাদের সামনে অস্পষ্ট হয়ে এসেছে।" লেখক কেন এই মন্তব্য করিয়াছেন?

৮। অরবিন্দ সম্বন্ধে যাহা জান বল।

৯। প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা কর ঃ

(ক) নবযুগ তখনই আসে যখন দেশের মধ্যে যুগপৎ ঘটে একটি মহত্তর আবির্ভাব আর সেই সঙ্গে একটি বৃহত্তর ঘটনা।

(খ) বাংলার স্বদেশী আন্দোলন ছিল এমনি একটি উদ্দেশ্যমূলক ও পরিণাম-অন্বিত আন্দোলন, সাময়িক উত্তেজনা বা হুজুগ মাত্র ছিল না।

১০। অর্থ লেখ ঃ

দৃশ্যপট, অভীপ্সা, ফলশ্রুতি, অগ্নিযুগ, জারিত।

॥ ব্যাকরণগত প্রশ্ন ॥

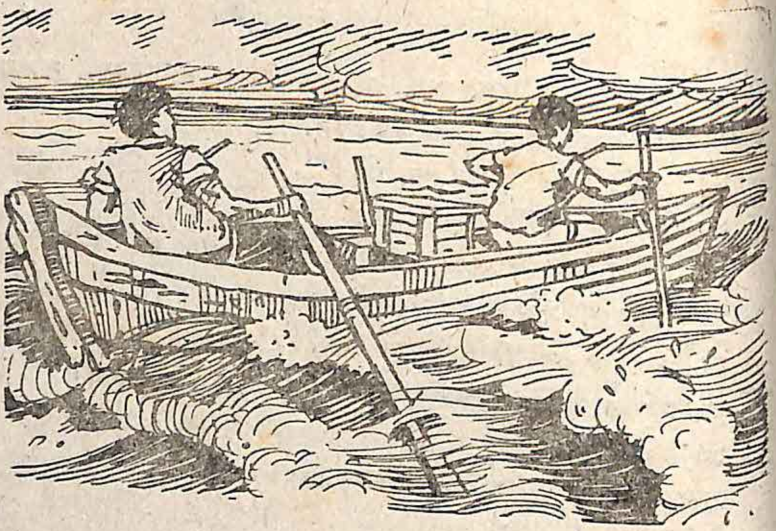
১১। পদান্তর কর ঃ

আবির্ভূত, চাপল্য, নির্দেশ, প্রয়োজন, স্বদেশী, সূচনা, অনুভূত, জারিত, বিস্মৃত।

১২। ব্যাসবাক্য সহ সমাস লেখ ঃ

ষণ্ডাগুণ্ডা, বজ্রমুষ্টি, সুদূরভবিষ্যৎ, দাসত্বশৃঙ্খলমোচন, দূরদর্শী, অব্যর্থ।

India's struggle for independence and paree note on Bagha Jatin.



বাঙালী তরুণের সমুদ্র অভিযান

॥ শান্তনু দাস ॥

[শ্রী শান্তনু দাস একজন তরুণ সাহিত্যিক ও সুলেখক। সাম্প্রতিক কালে অনুষ্ঠিত এক দুঃসাহসিক সাগর অভিযানের বর্ণনা তিনি এই রচনাংশে দিয়েছেন।]

“এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাসা তরী” —কবির স্বপ্ন এবার সফল হল। আধমরা বাঙালীর প্রাণস্রোত ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। সেই মরা নদীতে হঠাৎ জোয়ার আনলেন একজন বাঙালী তরুণ—নাম পিনাকীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সহযাত্রী ছিলেন আর এক দুঃসাহসী অভিযাত্রী, জর্জ এ্যালবার্ট ডিউক। তাঁরা দাঁড়ের নৌকোর সাহায্যে বঙ্গোপসাগর পার হয়ে আন্দামান পৌঁছেছিলেন। পিনাকী ও ডিউক এইভাবে নিজেদের জীবন তুচ্ছ করে ইতিহাস সৃষ্টি করে গেলেন।

কলিকাতা থেকে আন্দামান দ্বীপের দূরত্ব প্রায় ৮০০ মাইলের মত। পথের দূরত্ব এমন কিছু নয়; কিন্তু বিক্ষুব্ধ বঙ্গোপসাগরের ঢেউয়ের উপর দিয়ে পাড়ি দেওয়া একটি দাঁড়-টানা ছোট নৌকোর পক্ষে খুবই কঠিন কাজ। নৌকোটির ইঞ্জিন নেই, পাল নেই। শুধু

দাঁড়ই একমাত্র ভরসা। এই অভিযান যাতে সমস্ত ভারতবাসীকে প্রেরণা দেয়, সেইজন্য এর নামকরণ করা হল মৃত্যুঞ্জয়ী মারাঠা নাবিক অ্যাডমিরাল 'কানোজি আংরে'র নামে।

১লা ফেব্রুয়ারি (১৯৬৯) বিকেল তিনটের সময় যাত্রা শুরু হল। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর ত্রিগুণা সেন নৌকোটির বাঁধন খুলে আনুষ্ঠানিকভাবে শুভযাত্রা উৎসবের উদ্বোধন করলেন। উত্তাল সমুদ্রের অভিমুখে ভেসে চলল "কানোজি আংরে"।

১লা ফেব্রুয়ারি বিকেলে যাত্রা আরম্ভ করে বজবজ ঘুরে পরের দিন পড়ন্ত বেলায় পিনাকী ও ডিউক পৌছলেন ডায়মণ্ড হারবার। ৩রা ফেব্রুয়ারি অভিযাত্রী দুজন ভেসে এলেন হলদিয়া বন্দরে। হলদিয়ার প্রাচীন নাম তাম্রলিপ্ত। সেই কোন্ যুগ-যুগান্তের প্রাচীন তরঙ্গগুলো যেন ভেঙে পড়ছে তটভূমিতে। গাংচিলগুলো স্রোতের উপরেই ভেসে চলেছে তীর গতিতে। সূর্যাস্তের সময় ডিঙিটা বিখ্যাত রসুলপুর খাল পার হল। নদীর জলে বিচিত্র স্রোত। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উপরে উড়ে যাচ্ছে। বোধহয় তারা নীড়ে ফিরে যাবে। সূর্যাস্তের গিনি সোনার আলোয় তখন সারা আকাশ উদ্ভাসিত। সামনে শুধু জল আর জল। দূরে সাগর দ্বীপ ও কপিল মুনির মন্দির।

অভিযাত্রীরা এসেছেন অকল্যাণ্ডে। তারপর গ্যাসপার চ্যানেল। এখন সামনে পিছনে, ডাইনে বাঁয়ে চতুর্দিকেই সমুদ্র, শুধু জল আর জল। নদী মিশে গেছে সাগরে। আকাশের গায়ে দিগন্ত রেখা মিলিয়ে গেল।

হঠাৎ ৭ই ফেব্রুয়ারি ডিউক-পিনাকীর নৌকো থেকে বেতারে খবর আসা বন্ধ হয়ে গেল। কলকাতা থেকে তখন নৌকোটি রয়েছে ১৮১ সমুদ্র মাইল দূরে। অথচ তখন আকাশ পরিষ্কার। সাগর শান্ত। ডিউক ও পিনাকী বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন সমস্ত পৃথিবী থেকে। বিমানবাহিনী উড়ল বঙ্গোপসাগরের বুকে—তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান আরম্ভ করে দিল। কোথায় গেল ওরা দুজন? তারপর বঙ্গো-

পসাগরের মধ্যে থেকে একটি বিমান ১৪ই ফেব্রুয়ারি বেতারে সংবাদ দিল—নৌকোয় পিনাকী ও ডিউক ভাল আছেন। পিনাকীর বাড়ি ৬৮, সদানন্দ রোড, কালীঘাটে ও তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের কাছে এই সুসংবাদ পাঠানো হল। সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। ক' দিন সংবাদ পাওয়া যায় নি বটে, তবে পিনাকী ও ডিউক সমুদ্রের অতল তরঙ্গে ভেসে যান নি। তাঁরা তাঁদের ছোট নৌকোটিতে এগিয়ে চলেছেন আন্দামানের দিকে— তাঁদের লক্ষ্যপথে। ডিউকের বাবা-মা তখন কানাডায়, তাঁদেরও সপ্তাহব্যাপী উৎকণ্ঠার অবসান ঘটল।

'কানোজি আংরে'র লক্ষ্য আন্দামান। সমগ্র পথের দূরত্ব প্রায় হাজার মাইল। অন্তহীন দুরন্ত সমুদ্রের বুকে মোচার খোলার মত একটি ছোট ডিঙি; কিন্তু প্রকৃত অভিযাত্রীর কাছে মৃত্যুভয় তুচ্ছ। তাঁরা জানেন, অভিযাত্রীদের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। সে পথ দুর্গম ও বিপদসংকুল। সে পথ শাণিত ও ক্ষুরধার।

২৬শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ছইহীন নৌকোটি অগ্রসর হল আন্দামানের দিকে। তখনও আন্দামানের দূরত্ব প্রায় চারশ' মাইল। সম্ভবতঃ ওঁরা মোহানা থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকেই চলছিলেন।

আবার ২৭শে ফেব্রুয়ারি বেতারে নাবিকদ্বয়ের কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না। পুনরায় উৎকণ্ঠা! হয়তো নাবিক দুজন স্রোতের টানে 'কানোজি আংরে' সমেত মহাসাগরের অতলে তলিয়ে গেছেন!

১লা মার্চ ছোট নৌকোটির খবর পাওয়া গেল। বেলা দশটার সময় একটি ফৌজী বিমান ডিঙিটির দেখা পায়। পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ওঁরা তখন ২৭০ মাইল দূরে। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে এঁদের খাবার হল পঁচিশ কিলো একঘেয়ে টিনে-ভর্তি খাদ্য। ওঁরা তখন কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছেন। তা বলে ওঁদের উৎসাহ নিস্তেজ হয় নি অথবা মনোবল ভেঙে পড়ে নি। তেত্রিশ দিন পরে অভিযাত্রী দুজন আন্দামানের তীরে উপনীত হলেন, বুধবার ৫ই মার্চ, ১৯৬৯ সালে। তাঁরা

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের প্রথম ভূখণ্ড ল্যাণ্ডফলে পৌঁছে পাহাড়ের চূড়ায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

প্রশ্নাবলী ?

॥ **বিষয়গত প্রশ্ন** ॥

১। “কবির স্বপ্ন এবার সফল হল”—কোন্ কবির কথা বলা হইয়াছে? কবির কি স্বপ্ন ছিল? কি প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করা হইয়াছে?

২। পিনাকী ও ডিউক জীবন তুচ্ছ করিয়া কি ইতিহাস সৃষ্টি করেন?

৩। কলিকাতা হইতে আন্দামানের দূরত্ব কত? কানোজি আংরে কে ছিলেন?

৪। পিনাকী ও ডিউক কোন্ তারিখে তাঁহাদের যাত্রা শুরু করেন? এই যাত্রা উৎসবের শুভ উদ্বোধন কে করিয়াছিলেন? কোন্‌দিন তাঁহারা ডায়মন্ড হারবার পেঁাছাইলেন? হলদিয়ার প্রাচীন নাম কি ছিল?

৫। কোন্ তারিখে ডিউক-পিনাকীর নৌকা হইতে বেতারে খবর আসা বন্ধ হইয়া যায়? কলিকাতা হইতে তখন নৌকাটি কত দূরে ছিল? তাঁহাদের অনুসন্ধানে কোন্ তারিখে কলিকাতা হইতে বিমান বাহিনী যাত্রা শুরু করে? পিনাকী ও ডিউকের সংবাদ কবে পাওয়া গেল?

৬। কতদিন পরে কোন্ তারিখে অভিযাত্রী দুইজন আন্দামানের তীরে পেঁাছাইলেন? তাঁহারা কোথায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিলেন?

৭। প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা কর ঃ

(ক) সূর্যাস্তের গিনি সোনার আলোয় তখন সারা আকাশ উদ্ভাসিত। সামনে শুধু জল আর জল আর জল।

(খ) প্রকৃত অভিযাত্রীর কাছে মৃত্যুভয় তুচ্ছ।

৮। অর্থ লেখঃ

মরানদী, মৃত্যুঞ্জয়ী, নীড়, উৎকণ্ঠা, স্বস্তি, কুসুমাস্তীর্ণ, ক্ষুরধার।

॥ ব্যাকরণগত প্রশ্ন ॥

৯। স্থূলাক্ষর ক্রিয়াপদগুলির কাল নির্ণয় কর :

(ক) কবির স্বপ্ন এবার সফল **হল**।

(খ) তাঁর সহযাত্রী **ছিলেন** আর এক দুঃসাহসী অভিযাত্রী।

(গ) অভিযাত্রী দুজন ভেসে **এলেন** হলদিয়া বন্দরে।

১০। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :
বঙ্গোপসাগর, সূর্যাস্ত, চতুর্দিক, বিচ্ছিন্ন, কুসুমাস্তীর্ণ, নিস্তেজ।

১১। ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম বল :
প্রাণস্রোত, বিমানবাহিনী, অতল, নিস্তেজ, কুসুমাস্তীর্ণ।

The Story of an expedition by sea by two young Bengalees.

পদ্যাংশ



S.C.E.R.T., West Bengal
Library
Calcutta



সীতার বিবাহ

কৃত্তিবাস

[বাঙালীর 'প্রাণের কবি' কৃত্তিবাস ওঝা প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে নদীয়া জেলার অন্তর্গত ফুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল বনমালী ওঝা। এগার বৎসর বয়সে তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে দেশান্তরে যান। ক্রমে তিনি সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করেন এবং বাল্মীকি-রচিত মূল সংস্কৃত রামায়ণের স্বচ্ছন্দ বাংলা অনুবাদ করেন। এই কৃত্তিবাসী রামায়ণ বা শ্রীরাম পাঁচালী যুগ যুগ ধরিয়া বাঙালীর প্রাণের ধন হইয়া রহিয়াছে।]

গলে বস্ত্র দিয়া বলে জনক রাজন।
তব পুত্রে কন্যা দিয়া লইনু শরণ॥
দুই রাজা উঠি তবে কৈল সম্ভাষণ।
কন্যা আন আন বলে যত বন্ধুগণ॥
হেন বেশ ভূষণ পরায় সখীগণ।
যাহাতে মোহিত হয় শ্রীরামের মন॥
সখী দেয় সীতার মস্তকে আমলকী।
তোলা জলে স্নান করাইল চন্দ্রমুখী॥
চিরুণীতে কেশ আঁচড়িয়া সখীগণ।
চুল বান্ধি পরাইল অঙ্গে আভরণ॥
কপালে তিলক আর নির্মল সিন্দূর।
বালসূর্য সম তেজ দেখিতে প্রচুর॥

নাকেতে বেশর দিল মুক্তা সহকারে।
পাটের পাছড়া দিল সকল শরীরে ॥
গলায় তাহার দিল হার ঝিলিমিলি।
বুকে পরাইয়া দিল সোনার কাঁচলি ॥
উপর-হাতেতে দিল তাড় স্বর্ণময়।
সুবর্ণের কর্ণফুলে শোভে কর্ণদ্বয় ॥
দুই বাহু শঙ্খেতে শোভিত বিলক্ষণ।
শঙ্খের উপরে সাজে সোনার কঙ্কণ ॥
বসন পরায় তারে সুন্দর প্রচুর।
দুই পায়ে দিল তার বাজন-নূপুর ॥
সুবর্ণ আসনে বসিলেন রূপবতী।
চারিদিকে জ্বালি দিল সোহাগের বাতি ॥
চারি ভগিনীতে বেশ করি বিলক্ষণ।
তখন মণ্ডপে গিয়া দিল দরশন ॥
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তবে নমস্কার করে।
প্রদক্ষিণ সাতবার করিল রামেরে ॥
অবগুণ্ঠন ঘুচাইল যত বন্ধুগণ।
সীতা-রামে পরস্পর হৈল দরশন ॥
কন্যাদান করে রাজা বিবিধ প্রকারে।
পঞ্চ হরীতকী দিয়া পরিহার করে ॥
বহু দাস-দাসী রাজা দিল কন্যা-বরে।
জলধারা দিয়া কন্যা বর লৈল ঘরে ॥
রাজরাণী গিয়া পরে করিল রন্ধন।
কন্যা বর দুই জনে করিল ভোজন ॥
সাজায় বাসরঘর যত সখীগণ।
রাম সীতা তাহাতে রহেন দুইজন ॥

প্রশ্নাবলী ?

॥ বিষয়গত প্রশ্ন ॥

১। 'সীতার বিবাহ' কবিতাটির ভাবার্থ নিজের ভাষায় লেখ।

২। কবিতাটিতে সীতার বিবাহ-সজ্জার কি চিত্র ফুটিয়াছে?

৩। সীতা কাহার কন্যা এবং কাহার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল।

৪। ব্যাখ্যা লেখ ঃ

(ক) অবগুণ্ঠন ঘুচাইল······হৈল দরশন।

(খ) হেন বেশ ভূষণ······শ্রীরামের মন।

৫। শব্দার্থ বল ঃ

রাজন, তিলক, পাছড়া, কর্ণফুল, কঙ্কণ, অবগুণ্ঠন।

৬। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) যাহাতে—হয় শ্রীরামের মন।

(খ) দুই পায়ে ছিল তার—নূপুর।

(গ) সাজায়—যত সখীগণ।

॥ ব্যাকরণগত প্রশ্ন ॥

৭। সমাস নির্ণয় কর ঃ—

চন্দ্রমুখী, বালসূর্য, পুষ্পাঞ্জলি, জলধারা, বাসরঘর।

৮। ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর ঃ

সম্ভাষণ, স্বর্ণময়, রূপবতী, পরিহার, ভোজন।

Description of an Indian marriage ceremony.



[প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে বর্ধমান জেলার সিঙ্গি গ্রামে বাংলা ভাষায় সর্বাধিক জনপ্রিয় মহাভারত-রচয়িতা কাশীরাম দাসের জন্ম হয়। মহর্ষি বেদ-ব্যাসের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত মূল মহাভারতের এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাংলা অনুবাদটি কাশীরাম স্থানে স্থানে "আপন মনের মাধুরী" মিশাইয়া বাঙালীর রসরুচির উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণের ন্যায় কাশীদাসী মহাভারত-ও বাঙালীর নিজস্ব অমূল্য সম্পদ।]

অবন্তী নগরে ছিল দ্বিজ একজন।
তার স্থানে শিষ্যগণ করে অধ্যয়ন ॥
আরুণি নামেতে শিষ্য ছিল একজন।
ডাকি তারে গুরু আজ্ঞা কৈল ততক্ষণ ॥
ধান্যক্ষেত্রে সব জল যাইছে বহিয়া।
যত্ন করি আলি বাঁধি জল রাখ গিয়া ॥
আজ্ঞা মাত্র আরুণি যে করিল গমন।
আলি বাঁধিবারে বহু করিল যতন ॥
হস্তেতে খুদিয়া মাটি বাঁধে লয়ে ফেলে।
রাখিতে না পারে মাটি অতি বেগ জলে ॥
পুনঃ পুনঃ শিষ্যবর করিল যতন।
নারিল ক্ষেত্রের জল করিতে বন্ধন ॥
জল বহি যায়, পাছে গুরু ক্রোধ করে।
আপনি শুইল দ্বিজ বাঁধের উপরে ॥

সমস্ত দিবস গেল, হইল রজনী।
না আইল শিষ্য, দ্বিজ চলিল আপনি ॥
ক্ষেত্র মধ্যে গিয়া ডাক দিল দ্বিজবর।
শিষ্য বলে, শুয়ে আছি বাঁধের উপর ॥
বহু যত্ন করিলাম, না রহে বন্ধন।
আপনি শুইনু বাঁধে তাহার কারণ ॥
শুনিয়া বলিল গুরু আইস উঠিয়া।
শিষ্য আসি গুরু পায় প্রণমিল গিয়া ॥
আশিস করিয়া গুরু কহিল কল্যাণ।
চারি বেদ ষট্ শাস্ত্রে হোক তব জ্ঞান ॥
এত বলি বিদায় করিল শিষ্যবর।
প্রণাম করিয়া শিষ্য গেল নিজ ঘর ॥

প্রশ্নাবলী ?

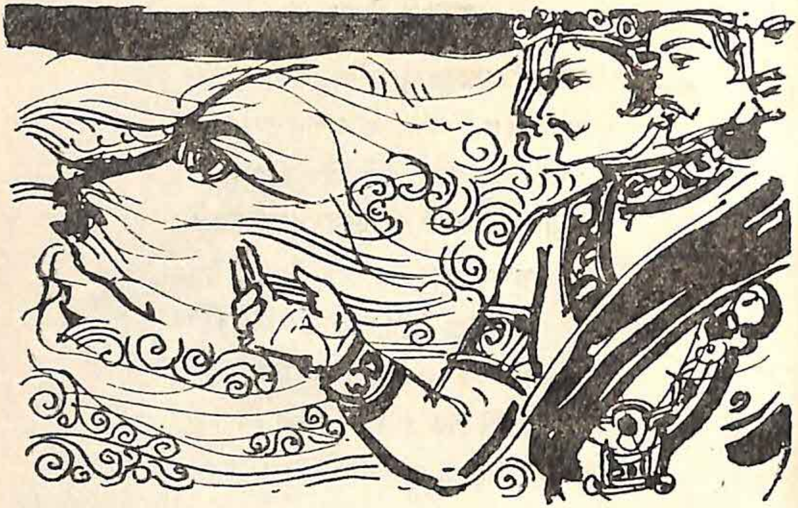
॥ বিষয়গত প্রশ্ন ॥

১। 'আরুণি উপাখ্যান' কবিতাটির সারাংশ নিজের ভাষায় সংক্ষেপে লেখ।
২। শিষ্য বাঁধের উপর কেন শুইয়া পড়িল তাহার কারণ বর্ণনা কর।
৩। রামায়ণ ও মহাভারতের মূল রচয়িতাদের নাম বল।
৪। "আশিস করিয়া গুরু···হোক তব জ্ঞান"—
এই কথা কে কাহাকে বলিয়াছিলেন? কেন এই কথা বলিয়াছিলেন?
৫। চারি বেদ ও ষট্ শাস্ত্রের নাম লেখ।

॥ ব্যাকরণগত প্রশ্ন ॥

। অশুদ্ধি সংশোধন কর ঃ
আরুনী, শিস্য, কল্যান, আশিষ, প্রনাম।
৭। ব্যাসবাক্য-সহ কি সমাস বল ঃ
শিষ্যগণ, ধান্যক্ষেত্রে, দ্বিজবর, শিষ্যবর।
৮। ব্যুৎপত্তি নির্ধারণ কর ঃ
শিষ্য, ক্রোধ, দ্বিজ, বন্ধন, প্রণমিল।

to teacher



সমুদ্রের প্রতি রাবণ

॥ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ॥

[বাংলা কাব্যসাহিত্যে নবযুগের প্রবর্তক মহাকবি মধুসূদন বর্তমান ব্যংলাদেশ রাষ্ট্রের যশোহর জেলায় সাগরদাঁড়ি গ্রামে এক সম্পন্ন অভিজাত কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন (জন্ম—২৫ জানুয়ারি, ১৮২৪; মৃত্যু—১৯ জুন, ১৮৭৩)। ইংরেজী, ফরাসী, গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি বহু য়ুরোপীয় ভাষায় সুপণ্ডিত মধুসূদন পরে সংস্কৃত সাহিত্যও ভালভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পয়ারের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত বাংলার কাব্যলক্ষ্মীকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া তিনি অমিত্রাক্ষর নামক মুক্ত ছন্দে তাঁহার অমর মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ' রচনা করেন। রচনার উৎস সংস্কৃত রামায়ণ হইলেও, চরিত্র-চিত্রণে গ্রীক মহাকাব্য ইলিয়াড প্রভৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট।]

কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে
প্রচেতঃ! হা ধিক্, ওহে জলদলপতি!
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য অজেয়
তুমি? হায়, এই কি হে, তোমার ভূষণ,
রত্নাকর? কোন্ গুণে, কহ, দেব, শুনি,
কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমায়?
প্রভঞ্জনবৈরী তুমি, প্রভঞ্জন সম

ভীম পরাক্রমে! কহ, এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন্ পাপে? অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে;
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে? এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী,
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামি,
কৌস্তুভ-রতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দয় এবে তুমি এর প্রতি?
উঠ, বলি! বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি,
দূর কর অপবাদ, জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।
রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখা,
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি!

প্রশ্নাবলী

বিষয়গত প্রশ্ন

১। "সমুদ্রের প্রতি রাবণ" কবিতাটির সারাংশ নিজের ভাষায় লেখ।

২। "কি সুন্দর মালা……ওহে জলদলপতি!"

ইহা কাহার উক্তি? কাহাকে লক্ষ্য করিয়া এই উক্তিটি করা হইয়াছে?

৩। "দূর কর অপবাদ……এ প্রবল রিপু"।

কি সেই অপবাদ? কি সেই জ্বালা? কাহাকে অতল জলে ডুবাইতে বলা হইয়াছে?

৪। ব্যাখ্যা লেখঃ

(ক) এই কি সাজে……রত্নাকর?

(খ) অধম ভালুকে শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে…বীতংসে?

৫। শব্দার্থ লেখ :

প্রচেতঃ, রত্নাকর, প্রভঞ্জন, বীভৎস, যাদুকর, জাঙাল।

৬। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) কোন্ গুণে—কিনেছে তোমায় ?

(খ) কৌস্তুভ-রতন যথা—বুকে।

॥ ব্যাকরণগত প্রশ্ন ॥

৭। সমাস নির্ণয় কর :

অলঙ্ঘ্য, রত্নাকর, জলদলপতি, প্রভঞ্জনবৈরী, নীলাম্বুস্বামি, কলঙ্ক-রেখা।

৮। ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর :

অলঙ্ঘ্য, অজেয়, দাশরথি, কেশরী, শৃঙ্খলিয়া।

Some Sarcastic comments on subjugation and lully inspiring remarks to provoke valour



খাটুলি

॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥

[কবীন্দ্র রবীন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা-র জন্য গদ্যাংশে "গঙ্গার শোভা" দ্রষ্টব্য ।]

একলা হেথায় বসে আছে, কেই বা জানে ওকে—
আপন-ভোলা সহজ তৃপ্তি রয়েছে ওর চোখে।
খাটুলিটা বাইরে এনে আঙিনাটার কোণে
টানছে তামাক বসে আপন-মনে।
মাথার উপর বটের ছায়া, পিছন দিকে নদী
বইছে নিরবধি।

আয়োজনের বালাই নেইকো ঘরে,
আমের কাঠের নড়্‌বড়ে এক তক্তপোষের' পরে
মাঝখানেতে আছে কেবল পাতা
বিধবা তার মেয়ের হাতের সেলাই-করা কাঁথা।
নাতনি গেছে, রেখে তারি পোষা ময়নাটাকে,
তেমনি কচি গলায় ওকে 'দাদু' ব'লেই ডাকে।

ছেলের গাঁথা ঘরের দেয়াল, চিহ্ন আছে তারি
রঙিন মাটি দিয়ে আঁকা সিপাই সারি সারি।
সেই ছেলেটাই তালুকদারের সর্দার পদ পেয়ে
জেলখানাতে মরছে পচে দাঙ্গা করতে যেয়ে।
দুঃখ অনেক পেয়েছে ও, হয়তো ডুবছে দেনায়,
হয়তো ক্ষতি হয়ে গেছে তিসির বেচাকেনায়।

বাহিরে তার দারিদ্র্যের
কাটা-ছেঁড়ার আঁচড় লাগে ঢের,
তবুও তার ভিতর-মনে দাগ পড়ে না বেশি—
প্রাণটা যেমন কঠিন তেমনি কঠিন মাংসপেশী।
হয়তো গরু বেচতে হবে মেয়ের বিয়ের দায়ে,
মাসে দুবার ম্যালেরিয়া কাঁপন লাগায় গায়ে,
ডাগর ছেলে চাকরি করত গঙ্গাপারের দেশে
হয়তো হঠাৎ মারা গেছে ঐ বছরের শেষে।

শুকনো করুণ চক্ষু দুটো তুলে উপর-পানে
কার খেলা এই দুঃখসুখের, কী ভাবলে সেই জানে
বিচ্ছেদ নেই খাটুনিতে, শোকের পায় না ফাঁক,
ভাবতে পারে স্পষ্ট ক'রে নেইকো এমন বাক্।
জমিদারের কাছারিতে নালিশ করতে এসে
কী বলবে যে কেমন ক'রে পায় না ভেবে শেষে।

খাটুলিতে এসে বসে যখনি পায় ছুটি,
ভাব্‌নাগুলো ধোঁয়ায় মেলায়, ধোঁয়ায় ওঠে ফুটি।
ওর যে আছে খোলা আকাশ, ওর যে মাথার কাছে
শিষ দিয়ে যায় বুলবুলিরা আলোছায়ার নীচে;
নদীর ধারে মেঠো পথে টাট্টু চলে ছুটে,

চক্ষু ভোলায় ক্ষেতের ফসল রঙের হরির-লুটে—
জনমমরণ ব্যেপে আছে এরা প্রাণের ধন,
অতি সহজ ব'লেই তাহা জানে না ওর মন।

প্রশ্নাবলী

॥ **বিষয়গত প্রশ্ন** ॥

১। 'খাটুলি' কবিতাটির মর্মকথা নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

২। কবিতাটিতে কবি যে চিত্র ফুটাইয়াছেন তাহা বর্ণনা কর।

৩। 'তবুও তার ভিতর মনে……কঠিন মাংসপেশী' কাহার মনে দাগ পড়ে নাই? দাগ পড়ার কারণটা কি? তাহার মানসিক অবস্থা বর্ণনা কর।

৪। "সেই ছেলেটাই………দাঙ্গা করতে যেয়ে" কোন্ ছেলের কথা বলা হয়েছে? সে কেন জেল খাটছে? তার আর কি কীর্তির কথা কবি আমাদের জানিয়েছেন?

৫। ব্যাখ্যা লেখ ঃ

(ক) তবুও তার ভিতর………কঠিন মাংসপেশী।
(খ) শুকনো করুণ………সেই জানে।
(গ) ভাবনাগুলো………ওঠে ফুটি।
(ঘ) জনমমরণ………ওর মন।

৬। শব্দার্থ লেখ ঃ খাটুলি, আঙিনা, টাট্টু।

৭। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

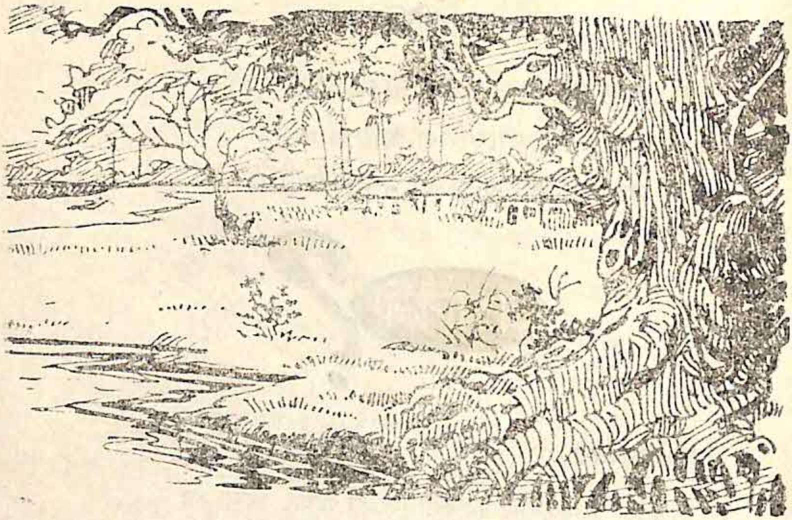
(ক) তেমনি কচি গলায় ওকে "——" বলেই ডাকে।
(খ) হয়তো ক্ষতি হয়ে গেছে —— বেচা কেনায়।
(গ) মাসে দুবার —— কাঁপন লাগায় গায়ে।
(ঘ) নদীর ধারে মেঠো পথে —— চলে ছুটে।
(ঙ) চক্ষু ভোলায় ক্ষেতের —— রঙের ——।

॥ **ব্যাকরণগত প্রশ্ন** ॥

৮। সমাস নির্ণয় কর ঃ
বেচাকেনা, জনমমরণ, আলোছায়া, গঙ্গাপার, নিরবধি।

৯। ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর ঃ
তৃপ্তি, দারিদ্র্য, তালুকদার, কাঁপন, শোক, মরণ।

picture of a simple, poor



স্বদেশ আমার

॥ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ॥

[কবি-পরিচিতি-র জন্য গদ্যাংশে "চন্দ্রগুপ্ত" নাট্যাংশ দ্রষ্টব্য ।]

স্বদেশ আমার !   নাহি করি দরশন
তোমা সম রম্যভূমি নয়ন-রঞ্জন ।
কোথায় হরিৎক্ষেত্র   আনন্দে ভাসাবে নেত্র,
তটিনীর মধুরিমা তুষিবে এমন ?
প্রভাতে অরুণ ছটা, সায়াহ্ন-অম্বরে
সুরঞ্জিত মেঘমালা শান্ত রবিকরে,
নিশীথে সুধাংশুকর   তারা-মাখা নীলাম্বর
কে ভুলিবে, কে ভুলিবে, থাকিতে জীবন ?

কোথায় প্রকৃতি এত খুলিয়া ভাণ্ডার
বিতরেন মুক্ত করে শোভারাশি তাঁর ?
প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি বনে,   প্রতি কুঞ্জে উপবনে,
কোথা এত শোভা হেন বিমোহে নয়ন ?

বসন্ত-কুসুম-রাজি বিবিধ বরণ
চুম্বি কোথা এত স্নিগ্ধ বয় সমীরণ।
তরুরাজি তব সম, কলকণ্ঠ বিহঙ্গম,
পাইব না, পাইব না, খুঁজি এ ভুবন।

প্রশ্নাবলী

॥ **বিষয়গত প্রশ্ন** ॥

১। 'স্বদেশ আমার' কবিতাটির সারাংশ লেখ।

২। কবিতাটির মধ্য দিয়া স্বদেশের যে চিত্র কবি আঁকিয়াছেন তাহা নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

৩। কবিতাটির প্রথম অথবা শেষ আট ছত্র মুখস্থ লেখ।

৪। ব্যাখ্যা লেখ ঃ
(ক) স্বদেশ আমার·········এমন ?
(খ) প্রভাতে অরুণ·········জীবন ?
(গ কোথায় প্রকৃতি·········নয়ন ?

৫। শব্দার্থ লেখ ঃ—রম্যভূমি, নেত্র, হরিৎক্ষেত্র, মধুরিমা, তটিনী, সায়াহ্ন, কুঞ্জ, বিমোহে, সমীরণ, বিহঙ্গম।

৬। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ
(ক) কোথায়—ক্ষেত্র আনন্দে ভাসাবে—
(খ) সুরঞ্জিত—শান্ত রবিকরে,
(গ) কোথা এত—হেন—নয়ন ?
(ঘ) তরুরাজি তব সম, কলকন্ঠ—

॥ **ব্যাকরণগত প্রশ্ন** ॥

৭। সন্ধিবিচ্ছেদ কর ঃ সুধাংশু, নীলাম্বর, সুরঞ্জিত।

৮। সমাস বল ঃ
রম্যভূমি, হরিৎক্ষেত্র, মেঘমালা, নীলাম্বর, কলকণ্ঠ।

৯। ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর ঃ
রম্য, মধুরিমা, বিহঙ্গম, শোভারাশি।

Eulogy to motherland.

চট্ জলদি কবিতা

॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥

[কলিকাতার জোড়াসাঁকোর সুবিখ্যাত ঠাকুর বাড়ির শ্রেষ্ঠ রত্ন ছিলেন কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই পরিবারেরই অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন রবীন্দ্রনাথের অন্যতম ভ্রাতুষ্পুত্র শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ (জন্ম—১৮৬৯ ; মৃত্যু—১৯৫১)। প্রধানতঃ তিনি ছিলেন এক অনন্য চিত্রশিল্পী। চিত্রশিল্পে পাশ্চাত্যের অনুকরণ পরিত্যাগ করিয়া প্রাচীন ভারতীয় চিত্রশিল্পকে তিনি নূতন করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করেন তাঁহার অসাধারণ বিভিন্ন শিল্পকীর্তির মাধ্যমে এবং এইভাবে Oriental School of Art নামে এক শিল্পধারার প্রবর্তন করেন। চিত্রশিল্পের ন্যায় গদ্য ও পদ্য সাহিত্যেও তাঁহার কৃতিত্ব ছিল সংশয়াতীত।]

'সমুদ্রটা কেমন ঠেকল
চক্কোত্তিমশয় ?'

'যেমনটা ভেবেছিলাম তেমনটা নয় !'

'হুঁকোটা নেন খুলে, কন—
ধুলো পায়ে কেমন হল
সমুদ্র মজ্জন।'

'মশয়, কিত্তিবাসে পড়েছিলেম
সাগর বর্ণন—
"তমোময় দেখা যায় গগনমণ্ডল।
হিল্লোল কল্লোল করে সাগরের জল॥
সিন্ধুজলে জলজন্তু কলরব করে।
জলেতে না নামে কেহ মকরের ডরে॥
এক এক জলজন্তু পর্বত প্রমাণ।
জগৎ করিবে গ্রাস হয় অনুমান।"

বাসা বাড়ি হতে দেখলেম
যা ভেবেছিলেম তার কিছু নয়।'

'তবে কেমন দেখলেন?'

"সাগর যোজন শত দেখি খালি জুলি"—
এ যে খড়ে নদীর খাল, মশয়।
কোন চিন্তা নাই, গামছাখানা কাঁধে,
তেল মেখে গেলেম ডুব দিতে একলাই।
দর্প ছিল—কেষ্‌নগর কলেজের ছেলে,
অবহেলে সাঁৎরে খড়ে পারাই।
কাছে গিয়ে দেখি কিত্তিবাস যা লিখে গেছে তাই,
উত্তাল তরঙ্গ-সমাকুল, কূলকিনারা নাই।
পাড় হতে ঢেউ দেখেই লাগল ভয়,
বলি, ও চক্রবর্তী. আর নিকটবর্তী হওয়া নয়।
বুঝি না কোন্ সাহসে
সাগরের এত কাছে আছেন বসে
বেঁধে বালির ঘর?—
বাপরে বাপ, কি জলের ডাক!
বুঝি না সারারাত জগন্নাথের
কি প্রকারে ঘুম হয়?
আমরা মানুষ বই তো নয়।'

'সাহেব সুবা রয়েছে, আপনার কি ভয়?'

'ওই একটা কথা, দেন হুঁকোটা,
কুয়াতলাটা ঘুরে আসি চট্‌জলদি—
হুঁকোর পর থেকে উড়ে যেতে চায় কল্কি
কাজেই উড়িষ্যা দেখা এরে কয়।'

প্রশ্নাবলী ?

॥ বিষয়গত প্রশ্ন ॥

১। 'চট্‌জলদি কবিতা'টির সারাংশ নিজের ভাষায় লেখ।

২। 'সমুদ্রটা কেমন ঠেকল চক্কোত্তিমশয়'—চক্রবর্তীমশায়ের সমুদ্রের বর্ণনাটি ইহার উত্তরে লিপিবদ্ধ কর।

৩। 'মশয়, কিত্তিবাসে পড়েছিলেম সাগর বর্ণন'—কৃত্তিবাস সাগরের কিরূপ বর্ণনা দিয়াছেন ?

৪। সমুদ্রে স্নান করিতে গিয়া চক্রবর্তীর শেষ পর্যন্ত কী অভিজ্ঞতা হয় ?

৫। ব্যাখ্যা লেখ ঃ

(ক) এক এক জলজন্তু……অনুমান।

(খ) বুঝি না সারারাত……বই তো নয়।

৬। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) তমোময় দেখা যায় —।

(খ) সিন্ধুজলে — কলরব করে।

(গ) কোন চিন্তা নাই—কাঁধে।

(ঘ) উত্তাল তরঙ্গ-সমাকুল—

(ঙ) বুঝি না কোন্ সাহসে……বালির ঘর।

(চ) সাহেব সুবা——আপনার কি ভয় !

॥ ব্যাকরণগত প্রশ্ন ॥

৭। সমাস নির্ণয় কর ঃ

তমোময়, গগনমণ্ডল, সিন্ধুজল, তরঙ্গ-সমাকুল।

৮। ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর ঃ

মজ্জন, জগৎ, নিকটবর্তী।

৯। শুদ্ধ রূপ লেখ ঃ

চক্কোত্তি, কেষ্টনগর, কিত্তিবাস।

A humorous poem.



[রবীন্দ্র-যুগের কবিদের মধ্যে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় রবীন্দ্র-অনুগামী কবি ছিলেন যতীন্দ্রমোহন বাগচী (জন্ম—২৭ নভেম্বর, ১৮৭৮ ; মৃত্যু—১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮)। পল্লীপ্রকৃতি ও পল্লীজীবন অবলম্বন করিয়া তিনি অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন।]

শরাস্তৃত সরোবর ; তীরে তীরে তারি তালীবনশ্রেণী ;
শ্যামল সরসী-শিরে পদ্ম-বিভূষণা শৈবালের বেণী।
ধীরে নামে সন্ধ্যাসতী ধূসর অঞ্চল অম্বরে লুটায়ে,
ঝিল্লীর মঞ্জীর মালা ঝিমি-ঝিমি-ঝিমি বাজে পায়ে।
জনশূন্য দুটি তীর—ধীবর-সন্তান গেছে ঘরে ফিরে',
ডোঙাগুলি কূলে-বাঁধা, শিহরিয়া কাঁপে সন্ধ্যার সমীরে ;
গোধন গুছায়ে লয়ে নিভ-নিভ হ'তে গোধূলি-আলোক ;
ফেলিয়া কলার ভেলা, ঘরে ফিরে গেছে রাখাল বালক।
নিভৃত কুলায়ে দিল মরালের দল শেষ-পাখাঝাড়া ;
নিঃসঙ্গ মরাল-শিশু চীৎকারিছে দূরে হ'য়ে দলছাড়া ;
ধূসর আকাশপটে তরঙ্গিয়া দিয়া ভ্রূবঙ্কিম-রেখা—
অস্পষ্ট নক্ষত্রালোকে বাদুড়ের শ্রেণী ঊর্ধ্বে দিল দেখা।
জলে স্থলে নভস্তলে মোহিনী সন্ধ্যার নির্বাক মন্তরে—
অশরীরী কল্পযন্ত্রে শান্তিরসধারা ঝর-ঝর ঝরে।

প্রশ্নাবলী?

॥ বিষয়গত প্রশ্ন ॥

১। 'সরোবরে সন্ধ্যা' কবিতাটির সারাংশ লেখ।

২। কবিতাটির অনুসরণে একটি সান্ধ্য পল্লীদৃশ্য বর্ণনা কর।

৩। সন্ধ্যা আসন্ন দেখিয়া ধীবর-সন্তান ও রাখাল বালক কি করিল, সংক্ষেপে বিবৃত কর।

৪। ব্যাখ্যা কর :

(ক) শরাস্তৃত সরোবর……শৈবালের বেণী।

(খ) ধীরে নামে……বাজে পায়ে।

(গ) জলে স্থলে……ঝর-ঝর ঝরে।

॥ ব্যাকরণগত প্রশ্ন ॥

৫। সন্ধিবিচ্ছেদ কর :

শরাস্তৃত, নির্বাক, নক্ষত্রালোকে।

৬। সমাস নির্ণয় কর :

তালীবনশ্রেণী, সন্ধ্যাসতী, জনশূন্য, গোধূলি, পর্ম্মবিভূষণা, কল্পযন্ত্রে, শান্তিরসধারা।

৭। গদ্যরূপ লেখ :

শিহরিয়া, চীৎকারিছে, তরঙ্গিয়া।

Description of a lake and its surroundings in the evening



মহাত্মা গান্ধী

॥ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ॥

['ছন্দের যাদুকর' সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (জন্ম—১২ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮২ ; মৃত্যু—২৫ জুন, ১৯২২) ছিলেন রবীন্দ্র-অনুগামী কবিদের অন্যতম শীর্ষস্থানীয়। বিভিন্ন ছন্দে তিনি বহু কবিতা রচনা করিয়াছেন এবং সংস্কৃত ও বিদেশী সাহিত্য হইতে অনুবাদ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।]

মহাজীবনের ছন্দে যে জন ভরিল কুলিরও হিয়া,
ধনী নির্ধনে এক করি নিল প্রেমের তিলক দিয়া,
দেশভাই যার গরিব বলিয়া সকল বিলাস ছাড়ি'
'গড়া' যে পরে গো, ফেরে খালি পায়ে, শোয় কম্বল পাড়ি ;

তপস্যা যার দেশাত্মবোধ, ছোটরও ছোটর সাথে,
দিনমজুরের খোরাকে যে খুশী তিন আনা পয়সাতে ;
দীনতম জনে যে শিখায় গূঢ় আত্মার মর্যাদা,
চিত্তের বলে লঙ্ঘিয়া চলে পাহাড়-প্রমাণ বাধা ;

সত্যাগ্রহে দহিয়া সহিয়া হয়েছে যে খাঁটি সোনা,
দেশের সেবার সাথে চলে যার সত্যের আরাধনা ;
অযুত কাজের মাঝারে যে পারে বসিতে মৌন ধরি'
শবরমতীর বরণীয় তীরে ধ্যানের আসন করি' ;

অর্জন যার ব্রহ্মচর্য, তপের বৃদ্ধি কাজে,
উজ্জ্বল যার প্রাণের প্রদীপ তর্ক-আঁধার মাঝে ;
ক্ষুদ্রে মহতে যে দেখেছে পরমাত্মার চির জ্যোতি,

দাস হ'তে, দাস রাখিতে, যে মানে চিত্তের অধোগতি,
মহাবাণী যার শকতি-আধার, অনুদার কভু নহে,
লুকানো ছাপানো কিছু নাই যার, হাটের মাঝারে কহে,—
"স্বরাজ-প্রয়াসী জাগো দেশবাসী, স্বরাজ স্থাপিতে হবে,
ত্যাগের মূল্যে কিনিব সে ধন, কায়েম করিব তপে।"

আত্ম-অবিশ্বাসের যে অরি, মূর্ত যে প্রত্যয়,
পরাজয় আজো জানে নি যে—সেই গান্ধীর গাহ জয়।

প্রশ্নাবলী?

॥ **বিষয়গত প্রশ্ন** ॥

১। 'মহাত্মা গান্ধী' শীর্ষক কবিতাটির সারাংশ লেখ।

২। 'মহাত্মা গান্ধী' কবিতাটি হইতে গান্ধীজীর চরিত্রের প্রধান প্রধান গুণগুলি আলোচনা কর।

৩। আলোচ্য কবিতাটি হইতে গান্ধীজীর একটি জীবন-আলেখ্য রচনা কর।

৪। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লেখ :

(ক) মহাজীবনের······পাড়ি।

(খ) উজ্জ্বল যার······অধোগতি।

(গ) মহাবাণী যার······হাটের মাঝারে কহে।

(ঘ) আত্ম-অবিশ্বাসের······সেই গান্ধীর গাহ জয়।

৫। টীকা লেখ :

মহাজীবনের ছন্দে, প্রেমের তিলক, স্বরাজ, শবরমতী, সত্যাগ্রহ।

৬। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) দিনমজুরের—যে খুশী। (খ) চিত্তের বলে লঙ্ঘিয়া চলে—বাধা। (গ) উজ্জ্বল যার প্রাণের—তর্ক-আঁধার মাঝে। (ঘ) জাগো দেশবাসী—স্থাপিতে হবে।

॥ ব্যাকরণগত প্রশ্ন ॥

৭। সমাস বল ঃ
মহাজীবনের, দেশাত্মবোধ, তর্ক-আঁধার, অনুদার।

৮। ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর ঃ
আরাধনা, বরণীয়, অর্জন, ব্রহ্মচর্য, বৃদ্ধি।

৯। সন্ধিবিচ্ছেদ কর ঃ
নির্ধন, সত্যাগ্রহ, উজ্জ্বল, পরমাত্মা, অধোগতি।

১০। পদান্তর কর ঃ
তপস্যা, আরাধনা, অর্জন, উজ্জ্বল, ত্যাগ, পরাজয়।

A beautiful rythmical pen picture of Mahatma Gandhi

———



মাতৃ আরাধনা

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

['পল্লীকবি' কুমুদরঞ্জন (জন্ম—৩ মার্চ, ১৮৮২ ; মৃত্যু—১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭০) সহজ সরল ভাষায় মধুর ছন্দে পল্লীর সৌন্দর্য, পল্লীবাসীর কৃত্রিমতাহীন অনাড়ম্বর জীবনের কথা তাঁহার বিভিন্ন কবিতায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ভক্তিরসাশ্রিত সুন্দর সুন্দর বহু কবিতাও তিনি লিখিয়া গিয়াছেন।]

মুক্ত-শুচি স্বাধীন দেশে তোমার পূজা আজ জননি,
দুই শতাব্দী পরে এবার স্বাধীন মধুর হুলুধ্বনি !
ঘট ভরেছি স্বাধীন জলে, স্বাধীন মধু কমলদলে,
স্বাধীন হাওয়ার যুগের 'পরে বাজছে তোমার আগমনী ॥

পরাধীন সব সুতের গৃহে বছর বছর এসেছ মা।
হেরি অধীনতার গ্লানি নয়নজলে ভেসেছ মা।
সন্তানের আর নিজের ঘরে এস এবার গর্বভরে।
'জয়ং দেহি দ্বিষোজহি' শুনে অনেক হেসেছ মা ॥

স্বাধীন ভারত প্রাচীন ভারত দেখে তুমিই চিনতে পার।
অখণ্ড তার প্রখর প্রতাপ ইতিহাসের আগেকারও।
শৌর্যেবীর্যে ভাবে ভাষায়, সান্ত্বনা ও অভয় আশায়,
ছিল সকল দেশ ও জাতির অহঙ্কার আর অলঙ্কারও ॥

আবার সেদিন সুখের সুদিন মাগো আবার উদয় হবে।
সকল জাতি দীক্ষা নিতে ইহার দ্বারে দাঁড়িয়ে রবে।
হবে ভারত নূতন করি, ভাবলোকে রাজরাজেশ্বরী।
মিশবে এসে স্বর্গ-মরত অমৃতের এই মহোৎসবে॥

প্রশ্নাবলী ?

॥ বিষয়গত প্রশ্ন ॥

১। 'মাতৃ-আরাধনা' কবিতাটির সারাংশ নিজের ভাষায় লেখ।

২। কবি কিভাবে মায়ের পূজার কথা বলিয়াছেন? পরাধীন দেশমাতার অবস্থা বর্ণনা কর।

৩। কবিতাটির প্রথম বা শেষ আট পঙক্তি মুখস্থ লেখ।

৪। ব্যাখ্যা লেখ ঃ

(ক) ঘট ভরেছি ··· আগমনী।

(খ) শৌর্যেবীর্যে ··· অলঙ্কারও।

(গ) সন্তানের আর······হেসেছ মা।

(ঘ) স্বাধীন ভারত······ইতিহাসের আগেকারও।

(ঙ) হবে ভারত······অমৃতের এই মহোৎসবে।

৫। শব্দার্থ লেখ ঃ

মুক্তশুচি, হুলুধ্বনি, কমলদলে, আগমনী, অধীনতা, অলঙ্কার, দীক্ষা, মহোৎসব।

॥ ব্যাকরণগত প্রশ্ন ॥

৬। সমাস নির্ণয় কর ঃ

মুক্তশুচি, হুলুধ্বনি, ভাবলোক, রাজরাজেশ্বরী, মহোৎসব, স্বর্গমরত।

৭। সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ

স্বাধীন, পরাধীন, দ্বিযোজহি, রাজরাজেশ্বরী, মহোৎসবে।

Eulogy to the independant mother



মানুষ

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

[রবীন্দ্র-যুগে জন্মিয়াও রবীন্দ্র-প্রভাবকে কাটাইয়া স্বীয় বৈশিষ্ট্যে যাঁহারা বাংলার কাব্যলক্ষ্মীকে সাজাইয়া গিয়াছেন, কবি-ইঞ্জিনিয়ার যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (জন্ম—২৬ জুন, ১৮৮৭ ; মৃত্যু—১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪) তাঁহাদের পুরোধা পুরুষ। সাধারণ মানুষের দুঃখ-দৈন্য অত্যাচার-নিপীড়িত জীবনের কথা গভীর সহানুভূতির সহিত তিনি তাঁহার কাব্যে তুলিয়া ধরিয়াছেন।]

পাঁচনি লইয়া গোরুর পালের পিছনে যারা
চলেছে দূরের মাঠে ;
ছিন্ন বসন, নিবারিতে ঘন শ্রাবণধারা
মাথায় নাহিকো আঁটে।
গাভীর পুচ্ছ ধরি' যারা তরে বর্ষানদী,
জুটে না পারের কড়ি,
হারা বাছুরের সন্ধানে ফেরে সন্ধ্যাবধি,
কাদায় কাঁটায় পড়ি'।
ক্ষুধার অন্ন, পরনের বাস, বাসের গেহ,
তাদের যদি না মেলে,
ঘৃণা কি করুণা ক'রোনা তাদের, করো গো স্নেহ—
তারা মানুষেরি ছেলে।

জ্যৈষ্ঠ দু'পরে গলদ্‌ঘর্ম বলদ ল'য়ে
চষে যারা রাঙা মাটি,
কত-না ঝঞ্ঝা মুষলের ধারা মাথায় ব'য়ে
ক্ষেত করে পরিপাটি ;
আশা যার ভাসে আকাশে আকাশে মেঘের বুকে,
ধরণীগর্ভে ধন ;
বোকামি পড়ে না ন্যাকামিতে ঢাকা যাদের মুখে,
ধূলা-কাদা আভরণ ;
অট্টালিকার উপায় থাকিতে হাজারতর,
যার চালা ঘুচে নাই,—
ঘৃণা কি করুণা ক'রো না তাদের, শ্রদ্ধা করো,—
তারা মানুষেরি ভাই।

শোভন করিয়া ঢাকিবে আপন লজ্জাটুকু—
জুটে নাই হেন বাস,
তারি খুঁটে যারা পিঠে ছেলে বেঁধে, রক্তমুখ,
তুলিছে মাটির রাশ,
যার নিরুপায় রূপের শিলায় নিয়ত ঝরে
ঘর্মের নির্ঝর,
সহ্য-অদ্রি সমান যে সহে বক্ষ 'পরে
লক্ষ দুঃখ ঝড় ;
মাঝপথে যার শিরে নিজ বোঝা দিতেছে পতি,
থাক্ বা না থাক্ শ্রী—
ঘৃণা কি কামনা ক'রো না তাদের, করো গো নতি,
তারা মানুষেরি স্ত্রী।

নির্বোধ যারা, দুর্বোধ যারা পল্লীপারে,
অশ্লীল যার ভাষা ;

আশী শতাব্দী ধরিয়া যাদের দৈন্য বাড়ে—
চির নাবালক চাষা।
হলের ফলকে লক্ষ্মী উঠিলে, করিয়া দান
লক্ষ্মীবানের ঘরে,
দুর্ভিক্ষের ভিক্ষার ঝুলি .ভরিয়া প্রাণ
দেয় যারা নিজ করে ;
বেতসের মতো সভ্যশিক্ষা শেখেনি যারা
হাওয়ার নেশায় মাতি'—
বটের মতন খোলামাঠে আজও রয়েছে খাড়া,
তারা মানুষেরি জাতি।

প্রশ্নাবলী ?

॥ বিষয়গত প্রশ্ন ॥

১। "মানুষ" কবিতাটির সারাংশ লেখ।

২। কবিতাটিতে মানুষ বলা হইয়াছে কাহাদের ? কেন ?

৩। "ঘৃণা কি করুণা……মানুষেরি ভাই"
কাহাদের 'মানুষেরি ভাই' বলা হইয়াছে ? ঘৃণা বা করুণা না করিয়া তাহাদের শ্রদ্ধা করিতে বলা হইয়াছে কেন ?

৪। ব্যাখ্যা লেখ :

(ক) ক্ষুধার অন্ন……মানুষেরি ছেলে।

(খ) জ্যৈষ্ঠ দু'পরে……পরিপাটি।

(গ) আশা যার ভাসে……ধূলা-কাদা আভরণ।

(ঘ) যার নিরুপায়……লক্ষ দুঃখ ঝড়।

(ঙ) হলের ফলকে……লক্ষ্মীবানের ঘরে।

(চ) বেতসের মতো ··মানুষেরই জাতি।

৫। শব্দার্থ লেখ ঃ

পাঁচনি, দু'পরে, গলদ্‌ঘর্ম, সহ্য-অদ্রি, হলের ফলকে।

॥ **ব্যাকরণগত প্রশ্ন** ॥

৬। সন্ধিবিচ্ছেদ কর ঃ

সন্ধ্যাবধি, গলদ্‌ঘর্ম, নির্বোধ, দুর্বোধ, দুর্ভিক্ষ।

৭। সমাস নির্ণয় কর ঃ

শ্রাবণধারা, বর্ষানদী, ধরণীগর্ভে, রক্তমুখ, শতাব্দী, দুর্ভিক্ষ।

৮। ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর ঃ

ছিন্ন, আভরণ, নতি, দৈন্য, লক্ষ্মীবান।

The peasants are not to be looked down upon. Peasants-artisans, labourers are to be treated sympathetically.

শহীদ-স্মরণে

॥ কবিশেখর কালিদাস রায় ॥

[শিক্ষক-সাহিত্যিক কালিদাস রায় (জন্ম—৯ জুলাই, ১৮৮৯ ; মৃত্যু—২৫ অক্টোবর, ১৯৭৫) ভক্ত বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সুপণ্ডিত ও সুকবি কবিশেখর একাধারে ছিলেন আদর্শ শিক্ষক, কবি, প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য-সমালোচক। তাঁহার পর্ণপুট, ব্রজরেণু প্রভৃতি কাব্য তাঁহার ভক্ত মনের ও কবি-প্রতিভার উজ্জ্বল সাক্ষ্য।]

বহু সাধনার বহু বেদনার ধন
স্বাধীনতা তব বোধন করি এ বঙ্গে।
এসেছে মূর্ত জীবন-মরণপণ,
এখনো রক্ত ঝরিছে তোমার অঙ্গে।

বরিতে তোমারে স্মরি আজ তাহাদেরে,
স্মরি সেই সব শহীদ স্বদেশভক্তে,
যাহারা তোমার উদয়ের গগনেরে
অরুণ করিয়া গিয়াছে হৃদয়-রক্তে।

তাদের মুক্ত মহান্ আত্মা মিলে
শুকতারা হয়ে জাগিল গগন-প্রান্তে।
অরুণোদয়ের আগেই তা' তিলে তিলে
তরল করিল অমানিশীথের ধ্বান্তে।

ভোর না হতেই ভোরের পাখীরা জাগি
ভোরের খবর জানাল কাকলী হর্ষে।
অশ্রু ঝরিছে আজি তাহাদেরি লাগি'
মূক যারা ক্রুর কিরাতের শর-বর্ষে।

কত বিগ্রহ কত নিগ্রহ জ্বালা
শত লাঞ্ছনা করিল না তারা গণ্য,

কণ্ঠে পরিল যূপের জবার মালা,
আজিকার জয়মাল্য তাদেরি জন্য।

সেই মাল্যটি দু'হাতে তুলিয়া ধরি
ঊর্ধ্বে চাহিয়া স্মরি সেই বীরবর্গে।
এই শুভদিনে অশ্রু পড়িছে ঝরি
জানি না তাহারা আছে কোন্ শূরস্বর্গে।

অসিত ও কেশ তাদেরি চিতার ধূমে,
অঙ্গে তোমার তাদেরি অস্থিচূর্ণ,
স্বাধীনতা তোমা বরি এ বঙ্গভূমে
তাদের কামনা আশা কর তুমি পূর্ণ।

জীবনের চেয়ে ব্রতে জেনেছিল বড়
ব্রতের মাঝারে আজো আছে তারা দীপ্ত,
সে ব্রত তাদের পূর্ণ সফল কর
তাতেই তাদের আত্মাও হবে তৃপ্ত ॥

প্রশ্নাবলী ?

॥ বিষয়গত প্রশ্ন ॥

১। কবিতাটির ভাবার্থ নিজের ভাষায় প্রকাশ কর।
২। কবি কিভাবে শহীদদের স্মৃতিতর্পণ করিয়াছেন তাহা বর্ণনা কর।
৩। শহীদ কাহাদের বলা হয়? তাঁহারা কিভাবে দেশের স্বাধীনতা আনিয়াছেন তাহা নিজের ভাষায় লেখ।

৪। ব্যাখ্যা লেখ :

(ক) বহু সাধনার……অঙ্গে।

(খ) ভোর না……বর্ষে।

(গ) কত বিগ্রহ……জন্য।

(ঘ) জীবনের চেয়ে……তৃপ্ত।

৫। টীকা লেখ : শহীদ, স্বাধীনতা, ক্রুর কিরাত, জীবন-মরণ, যুপের জবার মালা, শুরস্বর্গ, শুকতারা।

৬। অর্থ বল :

অমা, নিশীথিনী, যূপ, ধ্বান্ত।

॥ ব্যাকরণগত প্রশ্ন ॥

৭। সমাস নির্ণয় কর :

স্বদেশ-ভক্ত, জীবন-মরণ, হৃদয়রক্ত, শরবর্ষে, জয়মাল্য, শুভদিন, অস্থিচূর্ণ।

৮। ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর :

ভক্ত, রক্ত, দীপ্ত, তৃপ্ত।

৯। পদান্তর কর :

সাধনা, স্বাধীনতা, মূর্ত, মহান্‌, দীপ্ত, তৃপ্ত।

Hymn to the martyrs.



গাহি সাম্যের গান

॥ কাজী নজরুল ইসলাম ॥

['বিদ্রোহী' কবি কাজী নজরুল ইসলাম (জন্ম—২৪মে, ১৮৯৯; মৃত্যু—২২ আগষ্ট, ১৯৭৬) তাঁহার অগ্নিক্ষরা কবিতায় শোষিত নিপীড়িতের ব্যথাদীর্ণ জীবনের কাহিনী যেমন গাহিয়াছেন, তেমনি তাহাদের চিত্ত আগল-ভাঙা শেকল-ছেঁড়ার আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছেন। সঙ্গীতেও তাঁহার ছিল অসামান্য দক্ষতা। তাঁহার রচিত সঙ্গীতগুলি, বিশেষত তাঁহার বাংলা 'গজল' গানগুলি, চিরকাল সঙ্গীত-রসিকদের মনে আনন্দ যোগাইবে।]

গাহি সাম্যের গান—
যেখানে আসিয়া এক হ'য়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম ক্রীশ্চান।
গাহি সাম্যের গান!

কে তুমি?—পার্সী? জৈন? ইহুদী? সাঁওতাল, ভীল, গারো?
কন্‌ফুসিয়াস, চার্বাক-চেলা? ব'লে যাও, বলো আরো।
বন্ধু, যা খুশি হও,
পেটে পিঠে কাঁধে মগজে যা-খুশি পুঁথি ও কেতাব বও,
কোরাণ-পুরাণ-বেদ-বেদান্ত-বাইবেল-ত্রিপিটক-
জেন্দাবেস্তা-গ্রন্থসাহেব প'ড়ে যাও, যত সখ—

কিন্তু, কেন এ পণ্ডশ্রম, মগজে হানিছ শূল ?
দোকানে কেন এ দর-কষাকষি ?—পথে ফুটে তাজা ফুল !
তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব, সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা, খুলে দেখ নিজ প্রাণ।
তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম, সকল যুগাবতার,
তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকলের দেবতার।
কেন খুঁজে ফের' দেবতা ঠাকুর মৃত পুঁথি-কঙ্কালে ?
হাসিছেন তিনি অমৃত-হিয়ার নিভৃত অন্তরালে।

বন্ধু, বলিনি ঝুট,
এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট।
এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন,
বুদ্ধ-গয়া এ, জেরুজালেম্ এ, মদীনা, কাবা-ভবন,
মস্‌জিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়,
এইখানে ব'সে ঈসা মুসা পেল সত্যের পরিচয়।
এই রণ-ভূমে বাঁশীর কিশোর গাহিলেন মহা-গীতা,
এই মাঠে হ'ল মেষের রাখাল নবীরা খোদার মিতা।
এই হৃদয়ের ধ্যান-গুহা-মাঝে বসিয়া শাক্যমুনি
ত্যজিল রাজ্য মানবের মহা বেদনার ডাক শুনি'।
এই কন্দরে আরব-দুলাল শুনিতেন আহ্বান,
এইখানে বসি, গাহিলেন তিনি কোরাণের সাম-গান।
মিথ্যা শুনিনি ভাই,
এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো আর মন্দির-কাবা নাই।

প্রশ্নাবলী

।। বিষয়গত প্রশ্ন ।।

১। "গাহি সাম্যের গান" কবিতাটির সারাংশ নিজের ভাষায় লেখ।

২। "তোমাতে রয়েছে......নিজ প্রাণ।"—কবি কাহাকে উদ্দেশ করিয়া এবং কেন এ কথা বলিয়াছেন?

৩। কবির মতে দেবতা কি এবং কোথায় তিনি বিরাজিত?

৪। সব থেকে বড় মন্দির কোন্‌টি? কেন কবি ইহাকে সব থেকে বড় মন্দির বলিয়াছেন।

৫। আরব-দুলাল কে? তিনি কোন্ কন্দরে কিসের আহ্বান শোনেন?

৬। শাক্যমুনি কে? তিনি কোন্ রাজ্য কেন ত্যাগ করেন?

৭। নিম্নোক্তগুলি কি বা কে বল ঃ

কনফুসিয়াস, চার্বাক, কোরাণ, বেদ, ত্রিপিটক, জেন্দাবেস্তা, গ্রন্থসাহেব, কাবা, ঈসা, মুসা, গীতা, শাক্যমুনি।

৮। ব্যাখ্যা লেখ ঃ

(ক) কেন খুঁজে ফের......নিভৃত অন্তরালে।

(খ) এই রণভূমে......শুনি।

(গ) এই হৃদয়ের......কাবা নাই।

।। ব্যাকরণগত প্রশ্ন ।।

৯। সমাস নির্ণয় কর ঃ

যুগাবতার, ত্রিপিটক, পণ্ডশ্রম, বিশ্ব-দেউল, পুঁথি-কঙ্কালে, রাজমুকুট।

১০। কোন্ ভাষার শব্দ বল ঃ

কেতাব, কোরাণ, নবী, কাবা।

১১। পদান্তর কর ঃ

সাম্য, ধর্ম, পরিচয়।

A sympathetic heart is the true temp

জ্যৈষ্ঠের স্বপ্ন

॥ বিষ্ণু দে ॥

[রবীন্দ্র-প্রতিভা যখন বাংলা সাহিত্যের মধ্যগগনে সুতীব্র দীপ্তিতে প্রদীপ্ত, আধুনিক বাংলা কবিদের অন্যতম পুরোধা সুকবি বিষ্ণু দে সেই সময় কলিকাতায় এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সাহিত্য আকাডেমী পুরস্কার, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রভৃতির মধ্য দিয়া ভারতের সাহিত্যিক সমাজ তাঁহার কবি-প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিয়াছে। সম্প্রতি তিনি আমাদের ছাড়িয়া গিয়াছেন।

এ দিকে দোলে সোনালি সুখে আমনধান,
ও দিকে চলে অঘ্রানের নহবতের
দীর্ঘ লয়, পাহাড়ে ঢেউ পেরিয়ে যায়,
থমকে ভাবে বালির পাড়ে চক্রবাক্।

উদাসী মন দিগ্‌বলয় ধরতে চায়,
কারণ বুঝি সোনালি ধান নীল হাওয়ায়
আরামে দোলে, কারণ বুঝি স্বচ্ছ জল
চরের পাশে ধরেছে তার তরল গান।

উত্তরের প্রবাসী হাঁস হাজার ঝাঁকে—
আকাশে রেখা সরল ছবি. চীনের রেশ,
চলেছে রোজ দক্ষিণের বাংলা দেশ,
ওদিকে তোড়ি অঘ্রানের নহবতের।

উদাসী মন বিধুর তবু অচঞ্চল,
অঘ্রানের সূর্য যেন অস্তে যায়,
কিংবা ওঠে, রং ছড়ায় জহরতের
এ দিকে ডাকে অঘ্রানের সোনালি ধান।

প্রশ্নাবলী

॥ বিষয়গত প্রশ্ন ॥

১। 'জ্যৈষ্ঠের স্বপ্ন' কবিতাটির সারাংশ নিজের ভাষায় লেখ।

২। কবির বর্ণিত প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা দাও।

৩। কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা কোথায়?

৪। ব্যাখ্যা লেখ ঃ

(ক) উদাসী মন……তরল গান।

(খ) উদাসী মন বিধুর ……সোনালি ধান।

৫। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) উদাসী মন—ধরতে চায়।

(খ) ওদিকে—অঘ্রাণের নহবতের।

(গ) কিংবা ওঠে—ছড়ায়—।

॥ ব্যাকরণগত প্রশ্ন ॥

৬। সমাস নির্ণয় কর ঃ

প্রবাসী, অচঞ্চল।

৭। সন্ধিবিচ্ছেদ কর ঃ

স্বচ্ছ, অচঞ্চল, সোনালি।

৮। পদান্তর কর ঃ

সোনালি, উদাসী, স্বচ্ছ, তরল।

Dream of bright future in the days of adversity



পল্লী বাংলা

সুকান্ত ভট্টাচার্য্য

[সাধারণ গৃহস্থের গৃহে এই অসাধারণ প্রতিভাধর কবির জন্ম (জন্ম—১৫ আগস্ট, ১৯২৬; মৃত্যু—১৩ মে, ১৯৪৭)। মাত্র একুশ বৎসরের অতিসংক্ষিপ্ত জীবনকাল; কিন্তু তাহারই মধ্যে তিনি যে কবি-প্রতিভার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর। তাঁহার অগ্নিক্ষরা লেখনী শোষিতের বঞ্চনার কথা, শোষণ ও শোষকের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার কথা জ্বলন্ত ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়াছে।]

এখানে বৃষ্টি-মুখর লাজুক গাঁয়ে
এসে থেমে গেছে ব্যস্ত ঘড়ির কাঁটা,
সবুজ মাঠেরা পথ দেয় পায়ে পায়ে
পথ নেই তবু এখানে যে পথ হাঁটা।

এ গ্রামের পাশে মজা নদী বারো মাস,
বর্ষায় আজ বিদ্রোহ বুঝি করে,
গোয়ালে পাঠায় ইশারা সবুজ ঘাস,
এ গ্রাম নতুন সবুজ ঘাগরা পরে।

রাত্রি এখানে স্বাগত সান্ধ্য-শাঁখে
কিষাণকে ঘরে পাঠায় সে আল-পথ;
বুড়ো বটতলা পরস্পরকে ডাকে
সন্ধ্যা এখানে জড়ো করে জনমত।

দুর্ভিক্ষের আঁচড় জড়ানো গায়ে,
এ গ্রামের লোক আজো সব কাজ করে,
কৃষক-বধূরা ঢেঁকিকে নাচায় পায়ে,
প্রতি সন্ধ্যায় দীপ জ্বলে ঘরে ঘরে।

রাত্রি হলেই দাওয়ার অন্ধকারে
ঠাকুমা গল্প শোনায় যে নাতনীকে,
কেমন ক'রে সে-আকালেতে গতবারে
চলে গেল লোক, দিশাহারা দিকে দিকে।

এখানে সকাল ঘোষিত পাখীর গানে,
কামার, কুমোর, তাঁতী তার কাজে ছোটে,
সারাটা দুপুর ক্ষেতের চাষীর কানে
একটানা কত বিচিত্র ধ্বনি ওঠে।

হঠাৎ সেদিন জল আনবার পথে
কৃষক-বধূ সে থমকে তাকায় পাশে,
ঘোমটা খুলে সে দেখে নেয় কোন মতে,
সবুজ ফসলে সুবর্ণযুগ আসে।

প্রশ্নাবলী ?

॥ বিষয়গত প্রশ্ন ॥

১। 'পল্লীবাংলা' কবিতাটির যে কোন পর পর আট পঙক্তি মুখস্থ বল।

২। 'পল্লীবাংলা' কবিতাটির সারাংশ নিজের ভাষায় লেখ।

৩। কবিতাটিতে পল্লীজীবনের যে চিত্রটি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা বর্ণনা কর।

৪। ব্যাখ্যা লেখ :

(ক) হঠাৎ সেদিন……সুবর্ণ যুগ আসে।

(খ) দুর্ভিক্ষের আঁচড়……ঘরে ঘরে।

৫। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

(ক) পথ নেই — — যে পথ হাঁটা।

(খ) — গল্প — যে নাতনীকে।

॥ ব্যাকরণগত প্রশ্ন ॥

৬। সন্ধিবিচ্ছেদ কর :

স্বাগত, পরস্পর, দুর্ভিক্ষ।

৭। ব্যাসবাক্য সহ সমাস নির্ণয় কর :

বৃষ্টি-মুখর, আল-পথ, দুর্ভিক্ষ, কৃষক-বধূ, দিশাহারা, সুবর্ণযুগ।

৮। পদান্তর কর :

মুখর, বিদ্রোহ, সন্ধ্যা, ঘোষিত, বিচিত্র।

Picture of a typical Indian village.

S.C.E.R.T., West Bengal Library Calcutta 25/3, B. C. Road

S7
JUD